ইউনিট ৮: সমাজ ও শিক্ষা: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ
Society and Education: Bangladesh Context

ভূমিকা

১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে শিক্ষা ব্যবস্থাকেও ঢেলে সাজানোর কাজটি শুরু হয়। জাতীয় শিক্ষার যে ধারণা তা উনিশ শতকেই দানা বাঁধতে থাকে, সূচনা হয় জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের। তবে তা বাস্তবে রূপ নেয় বিশ শতকে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার যেমন রয়েছে গৌরবময় নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য, দর্শন তেমনি রয়েছে স্বতন্ত্র শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থা। বাংলাদেশের শিক্ষা ভাবনা, সামাজিক প্রেক্ষিত, শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে জানা ও এতোদসংক্রান্ত সামাজিক সমস্যাদির সমাধান করাও জরুরি। তাই বর্তমান ইউনিটে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সমাজ ও শিক্ষাকে ঘিরে যে বিষয়গুলো রয়েছে তা আটটি নিম্নরূপে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৮.১: সমাজ ও শিক্ষা

পাঠ ৮.২: শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পাঠ ৮.৩: পরিবার ও বিদ্যালয়

পাঠ ৮.৪: শিক্ষা ও মানব সম্পদের উন্নয়ন

পাঠ ৮.৫: গণমাধ্যম ও শিশু

পাঠ ৮.৬: শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক ও গোষ্ঠিগত মিথষ্ক্রিয়া

পাঠ ৮.৭: শিক্ষকতা পেশা

পাঠ ৮.৮: সামাজিক সমস্যাবলী ও শিক্ষা

পাঠ ৮.১: সমাজ ও শিক্ষা
Society and Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সমাজ ও শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।
- সমাজ ও শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সমাজ (Society)

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখারই রয়েছে নিজস্ব কিছু মৌল প্রত্যয়। সমাজবিজ্ঞান (Sociology)-এর ব্যতিক্রম নয়। সমাজবিজ্ঞানের মৌল ও প্রাথমিক প্রত্যয়সমূহের (Concepts) মধ্যে সমাজ একটি।

সমাজবিজ্ঞানের আলোচনার ও আগ্রহের মূল কেন্দ্রবিন্দু (Focus of Interest) হচ্ছে সমাজ বা Society। সমাজের একক ও সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা প্রদান করা অত্যন্ত কঠিন। সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। সমাজকে তিন ভাবে বিভক্ত করা যায়: ক্রিয়ার দিক থেকে (Functionally), কাঠমোগত দিক থেকে (Structurally) এবং গতিশীলতার দিক থেকে (Dunamically)। বিভিন্ন কারণে মানুষকে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করতে হয়। মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভের জন্য মানুষের দলবদ্ধ জীবন যাপন অপরিহার্য।

প্রকৃতপক্ষে সমাজ হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কের জাল বিশেষ, যা সর্বদা পরিবর্তনশীল এবং এই পরিবর্তনের মাধ্যমেই সমাজ ক্রমশ জটিল রূপ ধারণ করে। মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজ (MacIver and Page) সমাজ বলতে বুঝিয়েছেন, "Society is the well, of social relationships. It is changing and this ever-changing, complex system is called society".

সমাজের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন– সমরূপতা, পার্থক্য, পরস্পর নির্ভরশীলতা, সহযোগিতা। সমাজ হচ্ছে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। সমাজ একটি বিমূর্ত (Abstract) সত্তা। সমাজ একটি স্বাভাবিক সংগঠন এবং সমাজের সদস্যপদ বাধ্যতামূলক। সমাজের সাথে সর্বজনীন লক্ষ্য। শিক্ষা সমাজের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান। মার্কসীয় ধারণায়, সমাজ একটি পরিবর্তনশীল সত্তা।

শিক্ষা (Education)

'শিক্ষা' অতি পরিচিত একটি প্রত্যয়। তবে শিক্ষার একটি একক ধারণা সর্বজন গ্রাহ্যতা পায়নি। এর কারণ, শিক্ষা চিন্তাবিদদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য। দৃষ্টিভঙ্গীর ভিন্নতা সত্ত্বেও শিক্ষার 'ধারণা' ক্রমশ সামাজিক উপাদানসমূহের সঙ্গে অধিক সম্পৃক্ততা লাভ করেছে।

সাধারণ ধারণা অনুযায়ী মানুষ বা ব্যক্তি যা কিছু শেখে তাকেই শিক্ষা বলা যায়। 'শিখন' (Learning) অংশকে 'শিক্ষা' হিসেবে অভিহিত করা হয়। শিক্ষার কিছু কিছু দিক সর্বজনীন হলেও বহুলাংশেই তা সমাজকেন্দ্রিক আপেক্ষিকতা ও ভিন্নতা লাভ করেছে। শিক্ষা মানুষের জীবন ও সমাজ সম্পৃক্ত একটি প্রক্রিয়া। মানুষের সামাজিক বিবর্তন ধারার সাথে শিক্ষা যুক্ত। বলা যায়, সামাজিক বিবর্তন শিক্ষা প্রক্রিয়ারই ফল। আবার এও বলা চলে, শিক্ষার গতি-প্রকৃতি সামাজিক বিবর্তনের রূপ। ফলে একটা স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া হিসেবে শিক্ষাকে সমাজ প্রক্রিয়া থেকে পৃথক করা অসম্ভব। তাই শিক্ষাকে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করা হয় যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন

সমাজিক কর্ম-সাধিত হয়। বাংলাদেশের সমাজ ও শিক্ষার ক্ষেত্রেও ঠিক একই কথা প্রযোজ্য। ব্যতিক্রম কিছু নেই। শিক্ষা সমাজ বিচ্ছিন্ন কিছু নয় বরং সমাজ সংশ্লিষ্ট একটি বিষয় এবং সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, সমাজ যার মূল প্রতিপাদ্য।

সমাজ ও শিক্ষার পাস্পরিক সম্পর্ক (Society and Education Relationship)

সমাজের সাথে শিক্ষার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। যে কোনো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সেই দেশের সমাজ ব্যবস্থারই অন্তর্গত। সমাজবিহীন শিক্ষার কথা অকল্পনীয়। সমাজের মানুষের জন্যই শিক্ষা, সমাজেই এর বিস্তার। সমাজবিজ্ঞানীদের মত হলো, শিক্ষা ব্যবস্থা তাই সমাজ ব্যবস্থা ও সামাজিক জীবন ধারার বৈশিষ্ট্যে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এই ভূমিকা পালনের মধ্যেই শিক্ষার সঠিক তাৎপর্য নিহিত আছে। সমাজবিজ্ঞানীরা শিক্ষার সামাজিক তাৎপর্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সামাজিক তাৎপর্যের দিক থেকেই তাঁরা শিক্ষার ভূমিকাকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। সমাজের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই সমাজের আদর্শ, কৃষ্টি ও জীবন ধারার নিরবিচ্ছিন্নতা বজায়ে থাকে।

সমাজের সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে শিক্ষা নিয়ামক ভূমিকা পালন করে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা সমাজের সদস্যদের আচার-আচরণ নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে ও নিয়ন্ত্রিত হয়। শিক্ষা সামগ্রিকভাবে সমাজ ব্যবস্থাকেই নিয়ন্ত্রণ করে। এ জন্য বলা হয়, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকার সামাজিক তাৎপর্য অপরিসীম। আবার সমাজে প্রচলিত প্রথা-প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ, ন্যায়-নীতি, জীবন-ধারার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটে।

শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় হয়। সমাজের অন্তর্গত মানুষের মধ্যে শিক্ষাই গড়ে তোলে সুস্থ পারস্পরিক সম্পর্ক। আবার সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থার কল্যাণেই সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ ও নাগরিকদের অধিকার বজায় থাকে, সমাজ জীবনে সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। সমাজে সঠিক শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন হলে সেই শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের মানুষ শিক্ষিত, যুক্তিবাদী ও বিচারবোধ সম্পন্ন হয়। এবং সমাজের সকল ক্ষেত্রে, সকল সমস্যায় সঠিক বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। উপযুক্ত শিক্ষার প্রভাবে সমাজের মানুষ সমাজ সচেতন, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ হয়। এ জন্য যথার্থ শিক্ষিত একজন মানুষ সংকীর্ণ ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবমুক্ত থাকতে পারে। শিক্ষিত মানুষ সমষ্টিগত কল্যাণ সাধনে বা সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করতে পারে। সমাজের সঠিক শিক্ষা ওই সমাজের আদর্শ ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করে ব্যক্তিকে কুসংস্কার মুক্ত করে।

শিক্ষা হলো সমাজের উচ্চতর সোপানগুলোতে উন্নীত হবার জন্য সাহায্যকারী ও গুরুত্বপূর্ণ একটি হাতিয়ার। শিক্ষার দ্বারা সমাজের মানুষের সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এভাবে সমাজে শিক্ষা একটি নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া যা অর্জনের মাধ্যমে সমাজস্থ ব্যক্তি মার্জিত, পরিশীলিত, রুচিবোধ সম্পন্ন, জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত আত্মনিয়ন্ত্রিত, সুনাগরিক হয়ে গড়ে ওঠে। সমাজই তার সদস্যদেরকে শিক্ষালাভের সেই ব্যবস্থা করে দেয়। সমাজে বিদ্যালয়কে সমাজের ক্ষুদ্র একক বলা হয়। সমাজের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যালয় সমাজের মধ্যে ক্রিয়া করে এবং সমাজের আকাঙ্খা অনুযায়ী সমাজের সদস্যদের মধ্যে শিক্ষাদানের কাজটি সম্পাদন করে। সমাজ ছাড়া যেমন শিক্ষার অস্তিত্ব নেই তেমনি শিক্ষা ছাড়াও উন্নত সমাজের কথা কল্পনা করা যায় না। কাজেই সমাজ ও শিক্ষা একে অপরের পরিপূরক। উপরিক্ত আলোচনা বাংলাদেশের সমাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ বাংলাদেশের সমাজ কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। পৃথিবীর অন্যান্য সমাজের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য বাংলাদেশের সমাজের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। বাংলাদেশের সমাজেও শিক্ষা ও সমাজ একইভাবে সম্পর্কিত একথা অনায়াসে বলা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সমাজ কোন ধরনের সম্পর্কের জাল?
ক. রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের জাল
খ. সমাজনীতির জাল
গ. পারিবারিক সম্পর্কের জাল
ঘ. সামাজিক সম্পর্কের জাল

২. শিক্ষা হলো সমাজের উচ্চতর সোপানগুলোতে উন্নীত হবার অন্যতম কী?
ক. উপাদান
খ. ক্ষেত্র
গ. বিষয়
ঘ. হাতিয়ার

৩. শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজ জীবনের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণে কী ভূমিকা পালন করে?
ক. সহায়ক ভূমিকা
খ. ইতিবাচক
গ. সমন্বিত
ঘ. বলিষ্ঠ

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. ঘ ত. ক

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. সমাজ কী?
২. সমাজ সম্পর্কে ম্যাকাভাইভার সংজ্ঞা দিন?
৩. শিক্ষা কাকে বলে?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. সমাজ বলতে কী বোঝায়? সমাজ ও শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করুন।
২. 'বিদ্যালয় সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ'– ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৮.২: শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
Social Aims and Objective of Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সংকীর্ণ ও ব্যাপক অর্থে শিক্ষা কী তা বলতে পারবেন।
- শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষার সামাজিক তাৎপর্য নির্ণয় করতে পারবেন।

সংকীর্ণ ও ব্যাপক অর্থে শিক্ষা

শিক্ষা দার্শনিকগণ 'শিক্ষা' শব্দটিকে দুটো অর্থে গ্রহণ করেছেন। একটি সংকীর্ণ অর্থে, অন্যটি ব্যাপক অর্থে। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা ব্যক্তির সমগ্র জীবন ধরেই চলতে থাকে এবং জীবনের প্রায় প্রতিটি অভিজ্ঞতার দ্বারা তা সমৃদ্ধি লাভ করে। সেদিক থেকে ম্যাকোঞ্জি বলেন, শিক্ষা হলো একটি সার্বিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় এবং ব্যক্তি তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং যে বিশ্বে তারা বাস করে সেই বিশ্বের সাথে তাঁদের সম্পর্কও উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। দার্শনিক প্লেটোও তাঁর রিপাবলিক গ্রন্থে একথাই বলেন যে, শিক্ষা হলো সুস্থ দেহে সুস্থ মনের বিকাশ ঘটানো। তাঁর শিষ্য এ্যারিষ্টটল বলেন, মনের বিকাশ হবার সাথে সাথে ব্যক্তি সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের ধারণাকে উপলব্ধি করতে শেখে শিক্ষার মাধ্যমে। হোয়াইটহেড বলেন, বিকশিত জীবনই শিক্ষার লক্ষ্য। ব্যাপক অর্থে শিক্ষাকে যারা গ্রহণ করেছেন তারা সকলেই আত্মোপলব্ধি (Self realisation) কেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং শিক্ষাকে একটি আজীবন চলমান প্রক্রিয়ারূপেই গণ্য করেছেন।

কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষাকে গ্রহণ করে ম্যাকোঞ্জি বলেন, "সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা বলতে বুঝায় আমাদের সুপ্ত ক্ষমতাকে বিকশিত ও অনুশীলন করার জন্য সচেতনভাবে পরিচালিত যে কোন প্রচেষ্টাকে।" সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা হচ্ছে একটি উদ্দেশ্যমূলক প্রক্রিয়া। প্রয়োগবাদী দার্শনিক জন ডিউই এ কারণে শিক্ষাকে একটি ইচ্ছামূলক প্রক্রিয়া রূপে গণ্য করেন ও প্রগতি ও প্রায়োগিত শিক্ষা আন্দোলনের সূচনা করেন।

তাঁর মতে, বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলো কিভাবে সমাধান করা যেতে পারে তার পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং সেই পদ্ধতির উন্নতি সাধন করাই শিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। তবে শিক্ষার ব্যাপক অর্থ ও সংকীর্ণ অর্থ দুটোরই সমন্বয় দরকার সার্থক শিক্ষার জন্য। কেননা একজন ব্যাপক অর্থে শিক্ষিত হয়েও সংকীর্ণ অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত নাও হতে পারে। যেমন– জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গ্রন্থাবলী উচ্চ শ্রেণিতে পড়ানো হয় কিন্তু তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় তেমন অগ্রসর হতে পারেননি। আবার একজন সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষিত কিন্তু ব্যাপক অর্থে শিক্ষিত নাও হতে পারে। কাজেই আমরা বলতে পারি যে, সেই শিক্ষাই সত্যিকারের আদর্শ শিক্ষা যে শিক্ষা মানুষকে সমাজের উপযোগি করে গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা রাখে, জীবন সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে ও আধ্যাত্মিক সত্তার পূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে ব্যক্তিকে গড়ে তুলে।

শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বাস করার ফলেই মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। ব্যক্তি সমাজের দাস নয় বরং সামাজিক অর্থে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হলো এমন গুণ যা মানুষকে সমাজের শুধু একজন সভ্যই করে না, তার

চেয়ে অনেক বেশী কিছু করে। ব্যক্তি বুদ্ধি ও চেতনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে সচেতনভাবে তার স্বাতন্ত্রকে ফুটিয়ে তোলে সমাজে অন্যান্যদের সাথে নিজের একাত্মতা প্রকাশ করে সামাজিক প্রথা, রাতিনীতি ও মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করে। আর এসব কিছুই সম্ভব করে তোলে তার শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান বৃদ্ধির আলোকে। সুশিক্ষার কারণে ব্যক্তি যেমন সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ার সুযোগ পায় তেমনি সচেতন মানুষ হিসেবে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশও ঘটাতে পারে সমাজের ভেতরে বসবাস করে।

শিক্ষার ব্যক্তিগত ও সামাজিক তাৎপর্য দু'টোই রয়েছে। শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি তার অন্তর্নিহিত গুণগুলোকে বিকশিত করে। সামাজিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া ও ব্যক্তিগত জীবনের সর্বাঙ্গীন সফলতা শিক্ষার ওপরেই নির্ভরশীল। কিন্তু তাই বলে শিক্ষা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। শিক্ষার দ্বারা একদিকে যেমন সমাজের প্রয়োজন সাধিত হয়, তেমনি শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির সুষ্ঠু সামাজিকীকরণও নিশ্চিত হয়। আর এখানেই শিক্ষার সামাজিক গুরুত্ব নিহিত। প্রত্যেক শিক্ষার ব্যবস্থা একটি আদর্শগত দিক থাকে যা শিক্ষানীতিতে উল্লেখ করা থাকে। সে আদর্শ নিরূপিত হয় সমাজের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দ্বারা। আর প্রাথমিক শিক্ষা থেকে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকসহ সকল শ্রেণির শিক্ষায় সে আদর্শের প্রতিফলন ঘটে। আদর্শ শিক্ষা তাই এমন একটি হাতিয়ার যা ব্যক্তি মাত্রই গ্রহণ করে সমাজের আদর্শকেই বাস্তবায়ন করবে তার প্রতিটি কর্ম ও আচরণে। আর এ লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন আদর্শমানের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। মারগারেট মীড তাই বলেন, "শিক্ষা হলো একটি সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া, এমন একটি পদ্ধতি যাতে সদ্যোজাত মানব শিশু মানব সমাজের একজন পরিপূর্ণ সদস্যে পরিনত হতে পারে"। সুতরাং শিক্ষার সামাজিক তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম।

শিক্ষার সামাজিক উদ্দেশ্য

সমাজের যে প্রয়োজনগুলো শিক্ষার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় সেগুলোই শিক্ষার সামাজিক উদ্দেশ্য। নিম্নে সেগুলো পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো–

১. শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক আদর্শগুলো বাস্তবায়িত হয়। সামাজিক ভাবধারা, প্রথা, মূল্যবোধ, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বাস্তবায়ন ও স্থায়ীকরণ সম্ভব করে তোলে শিক্ষা।

২. সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার কোন বিকল্প নেই– সাম্য, মৈত্রি, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ইত্যাদি গুণগুলো শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি অর্জন করে এবং সামাজিক উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করে থাকে।

৩. প্রবীনদের কৃষ্টি, ইটিংস এটিং লালন-পালন ও বাস্তবায়নে শিক্ষাই ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে। শুধু তাই নয়, নবীনের চিন্তা-ভাবনা, নবজাগরণ যা সমাজের উন্নয়নে সহায়ক তা শিক্ষা মাধ্যমেই পরোক্ষভাবে প্রতিষ্ঠা পায়। যেমন– মুক্তচিন্তা, ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতার আংশিক চেতনার জন্য এদেশের নবীনরাই এগিয়ে আসেন।

৪. সমাজের অন্যায়, অত্যাচার, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের মত ভাবধারাকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য যে সংঘবদ্ধ প্রয়াস চালান হয় তার কেন্দ্রবিন্দু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা। কাজেই সমাজকে অনাচারমুক্ত করতেও শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৫. ব্যক্তির দায়িত্ববোধ, অধিকার ও কর্তব্য, অকল্যাণ ও অকল্যাণের ভাবধারা শেখানো শিক্ষার কাজ। সামাজিক আদর্শ সম্পর্কে সচেতনতা এ পথেই আসে। যে সমাজ যতবেশী শিক্ষিত সে সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা, উন্নয়ন সমৃদ্ধিও ততবেশী হয়।

৬. আদর্শ রাষ্ট্র গঠনে ও সুনাগরিক হিসেবে ব্যক্তিকে গড়ে তুলতে হলে সঠিক শিক্ষার প্রয়োজন, প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও। তবেই সমাজের সকলেই নিরাপদ হবে।

৭. নৈতিক অবক্ষয় সামাজিক অবক্ষয় ডেকে আনে শিক্ষাই পারে নৈতিক মূল্যবোধ ব্যক্তির মধ্যে জাগ্রত করতে। আর নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা পেলে সামাজিক অবক্ষয়রোধ করা সম্ভব হয়।

মোটকথা, বৃহত্তর সমাজের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে শিক্ষাই আমাদেরকে পরিচিত করে তোলে। শিক্ষার উদ্দেশ্যই হলো ব্যক্তিকে তার সুপ্ত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানোর সুযোগ দেয়া এবং তাকে সফল মানুষে পরিণত করা। যাতে সে আন্তর্জাতিক সমাজের সদস্য হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিক্ষার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ব্যাপক অর্থে শিক্ষা কি?
   ক. একটি আজীবন চলমান প্রক্রিয়া
   খ. নির্দিষ্ট সময়ের নির্দিষ্ট পাঠ গ্রহণ
   গ. একটি ইচ্ছামূলক প্রক্রিয়া
   ঘ. শিক্ষা একটি মানসিক প্রক্রিয়া

২. সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা বলতে কী বোঝায়?
   ক. একটি উদ্দেশ্যমূলক প্রক্রিয়া
   খ. সচেতনভাবে পরিচালিত প্রচেষ্টা
   গ. একটি ইচ্ছা মূলক প্রক্রিয়া একটি জীবনাদর্শ

৩. প্রকৃত শিক্ষা বলতে কী বোঝায়?
   ক. অধ্যাত্মিক সত্তার পূর্ণ বিকাশ
   খ. বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশ
   গ. মানুষকে সমাজের উপযোগী রূপে গড়ে তুলা
   ঘ. তার নৈতিকতার বিকাশ ঘটানো

৪. শিক্ষার প্রধান দুটি তাৎপর্য কী কী?
   ক, ব্যক্তিগত তাৎপর্য ও সামাজিক তাৎপর্য
   খ. সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় তাৎপর্য
   গ. নৈতিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য
   ঘ. কোনটিই নয়

৫. মাগারেড মীরড এর মতে শিক্ষা কি?
   ক. একটি সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া
   খ. মানব শিশুর সমাজের একজন পরিপূর্ণ সদস্য হিসেবে গড়ে তুলা
   গ. দু'টোই
   ঘ. কোনটিই না

উত্তরমালা: ১. ক, ২. ক, ৩. গ, ৪. ক, ৫. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষার সাধারণ তাৎপর্য কী?
২. সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা কী?
৩. শিক্ষার সামাজিক তাৎপর্য বলতে কী বুঝায়।
৪. শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্য কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. সংকীর্ণ ও ব্যাপক অর্থে শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করুন।
২. শিক্ষার সামাজিক উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা করুন।
৩. 'শিক্ষা ছাড়া সমাজ মূল্যহীন'– ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৮.৩: পরিবার ও বিদ্যালয়
Family and School

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পরিবার কী তা বলতে পারবেন।
- পরিবারের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।
- বিদ্যালয় কী তা বলতে পারবেন।
- বিদ্যালয় ও পরিবারের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবেন।

পরিবার

মানুষের সমাজ গঠিত হয় ছোট বড় কতকগুলো গোষ্ঠীকে নিয়ে। পরিবার হল সেই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতম এবং প্রাথমিক। গোষ্ঠী হিসেবে পরিবারকে প্রাথমিক বলা হয় এ কারণে যে, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যে সম্পর্ক তা অত্যন্ত নিবিড় ও মুখোমুখি এবং মিশুর সামাজিকীকরণের শিক্ষা সর্বপ্রথম পরিবারের মধ্যেই শুরু হয়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালবাসা নামক গুণগুলোর উৎপত্তি হয় পরিবার থেকেই।

সন্তানদের প্রবৃদ্ধি, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, নিরাপত্তা ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য পিতা-মাতা সদা তৎপর থাকে এবং প্রয়োজনবোধে আত্মত্যাগের জন্যও প্রস্তুত থাকে। সন্তানদের উপর কর্তৃত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠার ইচ্ছাও পিতা-মাতার থাকে। সন্তানদের জন্য গভীর ভালবাসা ও দায়িত্ববোধ, পিতা-মাতার অন্তরকে আবিষ্ট করে রাখে। পিতা-মাতা ও সন্তানদের মনে একই সংগঠনে অন্তর্ভূক্তির একটা বোধ বিরাজ করে। এই সংগঠনের নিজস্ব ঐতিহ্য, আদর্শ ও ভাবধারা আছে– এমন একটি ধারণা বা বিশ্বাস তাদের মনে কাজ করে। যা হোক পরিবারের প্রসার ঘটে নতুন শিশুর আবির্ভাবের ফলে– যার মূলে আছে নর-নারীর যৌনমিলন। এ কারণেই ম্যাকাইভার ও পেজ পরিবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "সন্তান উৎপাদন ও লালন-পালনের জন্য স্ত্রী-পুরুষের সুনির্দিষ্ট ও স্বামী যৌন সম্পর্ক দ্বারা নির্ধারিত গোষ্ঠীই হল পরিবার।" অধ্যাপক অগ্‌বার্ণ ও নিমকফ, বার্জেস ও লক, গিসবার্ট প্রমুখ লেখকগণ পরিবারের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের দেয়া সংজ্ঞা কম বেশী ত্রুটিপূর্ণ। এক্ষেত্রে R. F. Winch-এর দেয়া পরিবার সম্পর্কিত সংজ্ঞাটি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে আমরা মনে করতে পারি। তাঁর মতে, "পরিবার হল দুই বা ততোধিক ব্যক্তির একটি গোষ্ঠী যা বিবাহ সম্পর্ক, রক্ত সম্পর্ক অথবা দত্তক গ্রহণজনিত সম্পর্কের দ্বারা গঠিত, যারা একটি নির্দিষ্ট বাসস্থান গড়ে তুলে, যারা তাদের নিজ পরিবারিক ভূমিকায় একে অপরের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে এবং একটি সাধারণ কৃষ্টি বা ঐতিহ্য সৃষ্টি ও রক্ষা করে চলে।" পরিবারের উল্লিখিত সংজ্ঞা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, পরিবার সন্তানোৎপাদনের একটি স্বীকৃত সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সন্তানোৎপাদনের মাধ্যমে পরিবার বংশগতির ধারা অব্যাহত রাখে। পরিবার মানুষের জৈবিক প্রয়োজন মেটানো ছাড়া নানা প্রকার প্রয়োজন যেমন– অর্থনৈতিক, শিক্ষামূলক, ধর্মসম্পর্কীয়, স্নেহসম্পর্কীয়, আমোদ-প্রমোদমূলক ইত্যাদি মেটায়।

পরিবারের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

সামাজিক সকল সংগঠনের মধ্যে পরিবারই একমাত্র সংগঠন যার সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য অন্য যে কোন সংগঠনের চাইতে অনেক বেশি। পরিবার নানা দিক থেকেই সমাজের সমগ্র জীবনকে প্রভাবিত করে। সমগ্র সমাজ কাঠামোর মধ্যে পরিবারের পরিবর্তন প্রতিবিম্বিত হয়।

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজ তাঁদের Society গ্রন্থেপরিবারের আটটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল:

১. **সর্বজনীনত্ব:** সমাজের মধ্যে পরিবারেরই সর্বজনীন রূপ আছে। সকল সমাজে, সামাজিক বিকাশের সকল স্তরে এমন কি অসংখ্য ইতর প্রাণীর মধ্যেও পরিবারের রূপটি সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। প্রায় প্রত্যেকটি মানুষই কোন না কোন পরিবারের সদস্য।

২. **আবেগমূলক পদ্ধতি:** সহবাস, সন্তান উৎপাদন, সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার যত্ন ও অনুরাগ ইত্যাদি জৈবিক প্রবৃত্তি ও আবেগের উপর ভিত্তি করে পরিবার দাঁড়িয়ে আছে। পরিবারের মধ্যেই মানুষের প্রেম প্রীতি, ভালবাসা, স্নেহ-মমতা প্রভৃতি সুকোমল অনুভূতিগুলি জন্মলাভ করে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে ঈর্ষা, ঘৃণ্য, প্রভৃতি অবাঞ্ছনীয় অনুভূতিগুলিও পরিবারে দেখা যায়।

৩. **গঠনমূলক প্রভাব:** মানুষের সমাজ জীবনের অন্যান্য উন্নততর রূপগুলির মধ্যে পারিবারিক পরিবেশই হল প্রাথমিক পরিবেশ। এই পারিবারিক পরিবেশের মধ্যেই শিশু জন্মগ্রহণ করে এবং শিশুর দৈহিক ও মানসিক গঠনের উপর পারিবারিক পরিবেশ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

৪. **সীমিত আকার:** জৈবিক প্রয়োজনের দ্বারা পরিবারের সংগঠন নির্ধারিত হওয়ার কারণে পরিবারের আকার অত্যন্ত ক্ষুদ্র হয়। পরিবারই সবচেয়ে ক্ষুদ্র গোষ্ঠী। পরিবারের সরলতর রূপ হল একক পরিবার। একক পরিবার শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী ও এক বা একাধিক সন্তান নিয়ে গঠিত হয়।

৫. **সমাজ কাঠামোর মূল কেন্দ্র:** অন্যান্য সংগঠিত গোষ্ঠীর মূল কেন্দ্রবিন্দু হল পরিবার। পরিবারই সমগ্র সমাজ কাঠামোর একক। সমগ্র সমাজ কতকগুলি পরিবারের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়।

৬. **সদস্যদের দায়িত্ব:** অন্যান্য সংগঠনের তুলনায় পরিবারই একমাত্র সংগঠন সদস্যদের উপর যার দাবী সবচেয়ে বেশী। সংকটের সময় মানুষ দেশের জন্য কাজ করে এবং প্রয়োজনে যুদ্ধ করে কিন্তু পরিবারের জন্য সারা জীবন ধরে তারা কঠোর পরিশ্রম করে। নিজের প্রয়োজন ছাড়াও অন্যের জন্য কাজ করার শিক্ষা, অন্যের জন্য কঠিন দায়িত্ব পালন করার শিক্ষা মানুষ পারিবারিক জীবনেই গ্রহণ করে।

৭. **সামাজিক নিয়ম-কানুন:** সুশৃঙ্খলভাবে সামাজিক জীবন যাপনের স্বার্থে প্রত্যেক সমাজেই কতকগুলি অনুশাসন বা নিয়ম-কানুন থাকে। এই অনুশাসনগুলি সমাজের প্রত্যেককে মেনে চলতে হয়। পরিবার সামাজিক গোষ্ঠীগুলির অন্যতম। কাজেই পরিবারেরও কিছু অনুশাসন বা নিয়ম-কানুন থাকে যা প্রত্যেক পরিবারকে মেনে চলতে হয়। যেমন, বিবাহ প্রথা পরিবার মাত্রকেই মেনে চলতে হয়।

৮. **পরিবারের স্থায়িত্ব এবং অস্থায়িত্ব:** সংগঠন হিসেবের পরিবার যদিও স্থায়ী এবং সর্বজনীন তবু অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনের তুলনায় সংঘ হিসেবে পরিবার সবচেয়ে অস্থায়ী এবং পরিবর্তনশীল। পরিবার গড়ে উঠে একজন পুরুষ ও একজন নারীকে কেন্দ্র করে। কিন্তু এটি একটি অস্থায়ী সংগঠন। কারণ তাদের মৃত্যুর পর ঠিক সেই পরিবারটি আর থাকে না। কিন্তু এরপর তাদের সন্তানরা গড়ে তোলে নতুন পরিবার। পরিবারের এই অবিচ্ছিন্নতাই পরিবারের স্থায়িত্ব।

বিদ্যালয় যে সকল প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ব্যক্তি শিক্ষা লাভ করে সেই প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বিভিন্ন প্রকার হতে পারে।

শিক্ষা হলো সামাজিকীকরণের প্রথম ধাপ। পরিবারেই শিশুর সামাজিকীকরণ আরম্ভ হয়। সেদিক থেকে পারিবারিক গোষ্ঠীই হল শিশুর প্রথম ও প্রধান শিক্ষা কেন্দ্র। কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে সুনির্দিষ্ট ধারায় যদি শিশুকে শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে পারিবারিক গোষ্ঠী যথেষ্ট নয়। তাই শিশুর ক্রমবর্ধমান মনের দাবী মেটাতে হলে বিভিন্ন বয়সের শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা দরকার। যেমন– বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি।

বিদ্যালয় হচ্ছে শিশুর শিক্ষার প্রথম ও প্রধান কেন্দ্র। বাল্যকালে সুনির্দিষ্ট ধারায় শিক্ষা দেয়ার জন্যই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। কাজেই বিদ্যালয়ের প্রাথমিক কাজ হল শিশুকে অক্ষর পরিচয় করানো, লিখতে ও অঙ্ক কষতে শিখানো। কিন্তু শুধু এর মধ্যেই বিদ্যালয়ের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নয়। শিশুর চরিত্র গঠন ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনের দায়িত্বও বিদ্যালয়কে পালন করতে হয়। শিশুর শরীর চর্চার ব্যবস্থা এবং শিশু যাতে তার পরিবারের বিভিন্ন বস্তুকে ভালভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা বিদ্যালয়ের অন্যতম কাজ। এতে শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয়।

বিদ্যালয়ের প্রধান কাজসমূহ

১. **ভাল অভ্যাস ও চরিত্র গঠন:** শিশু যাতে তার বয়স, মানসিক প্রকৃতি, অনুরাগ ও রুচি অনুযায়ী জ্ঞান আহরণ করতে পারে সেদিকে বিদ্যালয়ের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। শিশু যাতে তার সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হতে পারে, যাতে তার ভাল অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে সে দিকেও বিদ্যালয়ের নজর রাখা কর্তব্য। শিশুর জ্ঞান, বুদ্ধি ও চিন্তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য যেরূপ শিক্ষার দরকার তা শিশুকে দেয়ার ব্যবস্থা করা বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ। এক কথায় যে শিক্ষা পেলে শিশু সংযত চরিত্র লাভ করতে পারবে বিদ্যালয়ে কর্তব্য হল সেই শিক্ষা শিশুর জন্য সুনিশ্চিত করা। কারণ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্যই হল চরিত্র গঠন।

২. **সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজে অংশগ্রহণ:** শিশু যাতে ভবিষ্যতে উপযুক্ত নাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারে সে জন্য দৃঢ় চারিত্রিক ভিত্তিও তৈরি করে দেয়া বিদ্যালয়ের কর্তব্য। বিদ্যালয়ের আর একটি কর্তব্য হল শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর সমাজ জীবনে প্রবেশ করার পথ প্রশস্ত করা। বিদ্যালয়ের পরিবেশ থেকে শিশু যে শিক্ষা গ্রহণ করে তা তার পরবর্তী জটিল সমাজ জীবনের বহু সমস্যার সমাধানে সহায়ক হয়। অপরের সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে কিভাবে কাজ করতে হয়, অন্যান্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে কিভাবে নিজের ক্ষমতায় স্ফুরণ ঘটানো যায় তা শিশু বিদ্যালয় থেকে শিখে। সে জন্য বিভিন্ন সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ যেমন, শীতার্তদের শীতবস্ত্র বিলি করা, বন্যার্তদের সাহায্য করা, বৃক্ষ রোপন, বিনোদনের জন্য পিকনিক বা বনভোজন করা এবং বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা। বিদ্যালয়ের পরিবেশে শিশুর মধ্যে 'আমরা-ভাব' (We-Feeling) জাগ্রত হয়। পড়ার সাথী, খেলার সাথী এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী বহির্ভূত অন্যান্য কাজের সাথীদের সঙ্গে মেলামেশার মধ্য দিয়ে শিশুদের মধ্যে এই 'আমরা-ভাব'-এর উন্মেষ ঘটে। বস্তুতঃ পক্ষে বিদ্যালয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য বহু বিস্তৃত।

৩. **কারিগরী শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা:** শিক্ষার্থীকে শুধু নির্দিষ্ট একটি পেশার উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুললেই বিদ্যালয়ের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। শিক্ষার্থী সামাজিক জীব হলেও সমাজের অন্যান্যদের সঙ্গে দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যে তার স্বাতন্ত্রও প্রচুর। কাজেই শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের যাতে পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে সে জন্য তার ব্যক্তিগত শিক্ষার প্রয়োজন। ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে যে উৎকর্ষ লাভ করে তার দ্বারা সমাজই উপকৃত হয়। সুতরাং বিদ্যালয়ের কর্তব্য হল শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো। শিক্ষার্থীর মধ্যে ভাল-মন্দের পার্থক্য করার ক্ষমতা, স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা, সত্যকে জানবার স্পৃহা, পরমত-সহিষ্ণুতা, সৃষ্টিধর্মী জিজ্ঞাসা, শ্রদ্ধাশীলভাব প্রভৃতি গুণগুলি সৃষ্টি করা বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তব্য।

৪. **উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান করা:** জনডিউই বিদ্যালয়ের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ বিদ্যালয়কে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেখানে শিশুর মানসিক উন্নতি সাধিত হতে পারবে। দ্বিতীয়তঃ যে সব বিষয়ের দ্বারা শিশুর মানসিক উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে বিদ্যালয়ের পরিবেশকে সেই সব বিষয় থেকে মুক্ত রাখতে হবে। তৃতীয়তঃ বিদ্যালয়ে একটি আদর্শ ও উচ্চতর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

৫. **ভাষা ও সামাজিক আদর্শ শেখান:** ম্যাকেঞ্জি বলেন যে, ফুল যেমন নিজে নিজে বিকাশ লাভ করে শিশুও তেমনি নিজে নিজে বিকাশ লাভ করবে তা আশা করা যায় না। ধীরে ধীরে জন জীবনে সে অংশগ্রহণ করবে সেই জন্য জীবনের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেয়া বিদ্যালয়ের কাজ। এই উদ্দেশ্য সমাজে যাদের সঙ্গে সে বাস করে তাদের ভাষা তাকে শিখতে হবে– যে ভাষার মধ্যে নিহিত থাকে সেই সমাজের জ্ঞান, অন্তদৃষ্টি, উদ্দেশ্য ও আদর্শ। সমাজের কাছ থেকে যে উত্তরাধিকার সে লাভ করে তা তাকে ধীরে ধীরে শিক্ষা দিতে হবে এবং এই শিক্ষা নির্ধারণ করতে হলে সতর্কতার সঙ্গে তার মানসিক বিকাশ লক্ষ্য করে এবং সহানুভূতির সঙ্গে তার প্রয়োজনগুলো বিবেচনা করে। এই কারণে একটি শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়োজনীয়তা আজ সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে।

৬. **সামাজিক ও জাতীয় ঐতিহ্য:** সমাজের ঐতিহ্যের মধ্যে যা কিছু ভাল, যা কিছু কল্যাণকর তাতে শিশুকে দীক্ষিত করাই বিদ্যালয়ের কাজ। সুন্দর গল্প বা প্রবাদ বাক্যের মাধ্যমে শিশুকে শিক্ষা দেয়া উচিত। কারণ এগুলির মধ্যে যে সুন্দর ভাব ও গভীর ব্যঞ্জনা থাকে তা শিশুর স্মৃতিতে স্থায়ীভাবে গেঁথে যায় এবং তার সারা জীবন ধরে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকে। যে সমস্ত নিয়ম-কানুন সমাজের ঐতিহ্যকে সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী রূপদান করেছে সেই সমস্ত নিয়ম-কানুন পাঠ্য পুস্তক পাঠের পূর্বেই শিশুদের শেখাতে হবে।

৭. **প্রকৃতিকে জানার ব্যবস্থা করা:** চারপাশের বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে শিশুকে ধীরে ধীরে পরিচিত করে তুলতে হবে। তার মনকে বিকশিত করে তুলতে হবে প্রকৃতিকে জানতে শেখানোর মধ্য দিয়ে। প্রকৃতিকে জানা শুরু হয় পর্যবেক্ষণ দিয়ে কিন্তু শীঘ্রই তা শিশুকে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করে। এ থেকে আসবে মানুষের জীবনকে জানার ইচ্ছা। আবার জীবনকে জানার ইচ্ছা তার মধ্যে জাগ্রত করবে রাষ্ট্রীয় ও নৈতিক বাধ্যবাধকতা জানার ইচ্ছাকে এবং সর্বশেষে জাগ্রত করবে মানুষের ইতিহাস জানার ইচ্ছাকে।

৮. **মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করা:** শিশুর সঞ্চিত জ্ঞান যদি কাজে না লাগানো যায়, তাহলে সেই জ্ঞানের কোন মূল্য নেই। শিশু যাতে তার জ্ঞান কাজে লাগাতে পারে সে জন্য শিশুকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে হবে। শিশুর মধ্যে যে কল্পনা শক্তি, সৃজনশক্তি ও মৌলিক চিন্তা শক্তি সুপ্ত অবস্থায় আছে বিদ্যালয়কে তার বিকাশের পথ করে দিতে হবে। প্রত্যেক বস্তুর যেমন প্রয়োজনের দিক আছে, তেমনি আছে তার সৌন্দর্যের দিক। শিশুর মধ্যে এই উভয় দিকের চেতনা সৃষ্টি করতে হবে। খেলাধুলা, শারীরিক ব্যায়াম ও আমোদ-প্রমোদের সুযোগ দিতে হবে শিশুকে। এর মধ্য দিয়ে মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার দৈহিক উন্নতি যেমন হবে তেমনি সে সমবেতভাবে কাজ করতেও শিখবে।

৯. **বিষয় জ্ঞান প্রদান:** শিশু যখন বিশ্লেষণ করবার চিন্তাশক্তি অর্জন করবে তখন বিদ্যালয়কে কতকগুলি বিষয় তাকে শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে– যেমন ব্যাকরণশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, জ্যামিতি, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রনীতি। এই বিষয়গুলি তাকে মানুষের জীবন এবং চারপাশের জগৎকে বুঝতে সাহায্য করবে। এরপর তারা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হবে তখন স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের অসুবিধাগুলি এবং পারিবারিক জীবনের সাধারণ সমস্যাগুলি সম্পর্কে তাদের কিছু সুস্পষ্ট জ্ঞান দিতে হবে।

১০. **নিয়মানুবর্তিতা শেখান ও শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষা:** বিদ্যালয়ে শিশুরা নিয়মানুবর্তিতা শিখবে। তাদের অভ্যাস ও মন-মানসিকতার বিরুদ্ধে জোড়পূর্বক কিছু করা যাবে না। তেমনি শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক। কাজেই শিক্ষার্থী তার নিজস্ব ক্ষমতা ও প্রবণতা অনুসারে যা শিখতে পারে তা-ই তাকে শেখানো উচিত। শিক্ষার্থীর শুধুমাত্র বৃদ্ধিগত উৎকর্ষ বা বিদ্যালয়ের কঠোর ও অনুশাসনের উপর গুরুত্ব না দিয়ে তার অনুভূতিপ্রবণতা, তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা, তার সামর্থ্য, তার সামাজিকতাবোধের উৎকর্ষ ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দেয়া দরকার।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন বিষয় পাঠ করতে ছাত্রদের বাধ্য করা বার্ট্রান্ড রাসেলও সমর্থন করেননি। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার ভাবও ক্ষতিকর। প্রতিযোগিতার শিক্ষার্থীর সুপ্ত ক্ষমতায় বিকাশ সাধনে সাহায্য করলেও যদি সেই প্রতিযোগিতার ভাব সুনিয়ন্ত্রিত করা না হয় তাহলে শিক্ষার্থীর মনে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ক্রোধ ইত্যাদি অসামাজিক মনোভাব দেখা দেয়। শিক্ষা দেয়ার সময় এদিকটির প্রতি বিদ্যালয়ের লক্ষ্য রাখা উচিত।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, বিদ্যালয়ের কাজ হল শিশুর জ্ঞান বৃদ্ধি করা, বুদ্ধির উৎকর্ষ বিধান করা, তার দৃষ্টিকে প্রসারিত করা, তার সামাজিক কর্মকুশলতা বৃদ্ধি করা এবং তাকে সুনাগরিক হতে শিক্ষা দেয়া। আর এসব কাজ সম্ভব যখন পরিবার বিদ্যালয়াকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে। আবার শিশুর শিক্ষা তখনই সফল হবে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যখন পরিবারের সাথে সলা পরামর্শ করে কাজ করেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, শিশুর পূর্ণ বিকাশে পরিবার ও বিদ্যালয়ের দায়িত্ব যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি এ দু'য়ের সম্পর্ক ও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. পরিবার হলো শিশুর–
   ক. গৌন শিক্ষা কেন্দ্র
   খ. বিকাশ কেন্দ্র
   গ. প্রধান ও প্রথম শিক্ষা কেন্দ্র
   ঘ. উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু

২. শিক্ষা হলো সামাজিকীকরণের–
   ক. প্রথম ধাপ
   খ. প্রধান ধাপ
   গ. সর্বশেষ হাতিয়ার
   ঘ. উপায়মাত্র

৩. পরিবার সমাজ কাঠামোর কী?
   ক. একক
   খ. উপায়
   গ. কেন্দ্র
   ঘ. অনন্যরূপ

উত্তরমালা: ১. গ, ২. ক, ৩. ক

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. পরিবারের সংজ্ঞা দিন।
২. পরিবারের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
৩. বিদ্যালয় বলতে কী বুঝায়?
৪. বিদ্যালয়ের প্রধান তিনটি কাজ কী কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. পরিবারের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন ও পরিবারের প্রধান কাজগুলি চিহ্নিত করুন।
২. পরিবারের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।
৩. বিদ্যালয় বলতে কী বুঝায়? শিশুর বিকাশে বিদ্যালয়ের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।
৪. পরিবার ও বিদ্যালয়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করুন।

পাঠ ৮.৪ শিক্ষা ও মানব সম্পদের উন্নয়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মানব সম্পদ কী বলতে পারবেন।
- মানব সম্পদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মানব সম্পদ উন্নয়ন সূচক ও উপাদান বর্ণনা করতে পারবেন।
- মানব সম্পদ উন্নয়ন কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।
- মানব সম্পদ উন্নয়ন চক্র বর্ণনা করতে পারবেন।
- মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা পর্যালোচনা করতে পারবেন।

গুরুত্ব

মানব সম্পদ উন্নয়ন হচ্ছে একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। মূলত একটি দেশ বা কোনো সংগঠনের মানব সম্পদ উন্নয়ন নির্ভর করে এর সুষ্ঠু ও যথাযথ মানব কক্ষ ব্যবস্থাপকের উপর, আর একটি প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও সাফল্য নির্ভর করে মূলত এর কার্যকর মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে।

মানব সম্পদ ও মানব সম্পদ উন্নয়নের ধারণা
Concept of Human Resource and Human Resource Development

সাধারণ অর্থে জনসংখ্যার যে অংশ সামাজিক উৎপাদনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে, তাকেই বলা হয় মানব সম্পদ। আর এ ধরনের মানব সম্পদ সৃষ্ঠির প্রক্রিয়াই হলো মানব সম্পদ উন্নয়ন। ইউএনডিপির প্রতিবেদন অনুযায়ী মানব উন্নয়ন হচ্ছে মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলি এবং তার সম্ভাবনা সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মান উন্নয়ন।

William E. Glueck-এর মতে "মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা হচ্ছে ঐ সকল সিদ্ধান্ত ও কার্যাবলি, যা সংগঠন ও কর্মীদেরকে কাজে উৎসাহিত করে।"

Keith Davis-এর মতে মানব সম্পদ হচ্ছে ঐ সকল ব্যক্তি ও জনগণ যারা স্বেচ্ছায়, স্বপ্রণোদিত হয়ে সংগঠনের/প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনে তথ্য লক্ষ্যে পৌঁছাতে অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

ওপরের সংজ্ঞাগুলোর পর্যালোচনায় দেখা যায় মানব সম্পদগুলো তারাই যারা জ্ঞান, দক্ষতা, সক্ষমতা, সুস্থতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন করে পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সমাজ ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখার কাজ করতে সক্ষমও করে থাকে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন সূচক (Human Resource Development Indication HDI)

UNDP কর্তৃক মানব সম্পদ উন্নয়ন সূচক তথা HDI ধারণাটির উদ্ভাবন হয়। HID কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের (যেমন– আয়ুকাল, বয়স্ক শিক্ষার হার, বয়স্কদের স্কুলে গমনের গড়পড়তা বছর, মাথাপিছু আয় বা (GDP) ইত্যাদিকে বুঝায়। নিচে মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রধান সূচকগুলো আলোচনা করা হলো–

১. **স্বাস্থ্যঃ** কোন ব্যক্তিকে তখনই সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হবে, যখন সে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। অসুস্থ ব্যক্তি সমাজের বোঝাস্বরূপ। সে কখনও সমাজের সম্পদ হতে পারে না। ব্যক্তির স্বাস্থ্যের উন্নয়ন নির্ভর করে বিদ্যমান স্বাস্থ্য সেবা, স্বাস্থ্যনির্দেশন, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্ঠি, নিরাপদ পানি, সুস্থ পরিবেশ, সচেতনবোধ ইত্যাদির উপর ।

২. **দক্ষতাঃ** কোন ব্যক্তিকে তখনই সামাজিকভাবে মানব সম্পদ বলা যাবে যখন যে কোন না কোন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় দক্ষতার সাথে অংশগ্রহণ করবে। এ জন্য তাকে পেশাগত, বিষয়গত, আচরনিক ভাষাগত ইত্যাদি দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

৩. **বিশেষ মানসিক কর্ম ক্ষমতাঃ** প্রত্যেক মানুষের সাধারণ মানসিক ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে কিছু না কিছু বিশেষ মানসিক ক্ষমতা থাকে। যা তাতে বিশেষধর্মী কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সহায়তা করে। বর্তমানে সমাজের উন্নয়নে বহুমুখী উৎপাদন প্রয়োজন। তাই ও উৎপাদন ব্যবস্থাকে সচল রাখতে কর্মক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির প্রয়োজন। কেবল মাত্র বিশেষ মানসিক ও কর্মদক্ষতা সম্পন্নদের পক্ষেই তা করা সম্ভব। অতবে ব্যক্তির বিশেষ মানসিক ও কর্মদক্ষতা মানব সম্পদের উন্নয়ন।

৪. **সাক্ষরতা ও শিক্ষাঃ** মানব সম্পদ উন্নয়নে এ উপাদানটির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সাক্ষরতা ব্যক্তির চিন্তাশক্তির উন্মেষ ঘটায়। যার ফলে সে সামাজিক সমস্যাকে যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ ও সমস্যার সমাধানে নির্ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তার জীবন পরিবেশকে উপলব্ধি করতে পারে ও এর উন্নয়ন মুখী পরিবর্তন আনতে পারে। তাই সাক্ষরতা মানব সম্পদের একটি আবশ্যিক উপাদান।

৫. **কর্মে নিযুক্তিকরণঃ** কেবল মাত্র, সমাজে বা রাষ্ট্রে পর্যাপ্ত মানব সম্পদ থাকলেই হবে না। ঐ সম্পদ যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে উৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহার করা গেলেই তা প্রকৃত সম্পদ বলে পরিগণিত হবে। সুতরাং, মানব সম্পদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর ব্যবহার। আদর্শ গুণ সম্পন্ন নিষ্ক্রিয় ব্যক্তি কখনই সমাজের সম্পদ হতে পারে না। যে ব্যক্তি সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নিজেকে নিযুক্ত করার সুযোগ পায়, সেই প্রকৃত মানব সম্পদ।

৬. **নৈতিকতাঃ** মানব সম্পদের সকল বৈশিষ্ট্য অর্জনের পরও একজন ব্যক্তি যদি নীতি ও নৈতিকতার দ্বারা পরিচালিত না হন তাহলে যে জনসম্পদের পরিবর্তে জনশত্রুতে পরিণত হবে। তাই জনসম্পদে অন্যান্য গুণাবলি অর্জনের সাথে সাথে ব্যক্তিকে সততা, নিষ্ঠা, স্বচ্ছতা, সময়ানুবর্তিতা, শিষ্ঠাচার, জবাবদিহিতা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলি অর্জন ও চর্চা করতে হবে।

মানব সম্পদ উন্নয়নের উদ্দেশ্য ও কৌশল

মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রধান তিনটি উদ্দেশ্য হলো–

১. প্রত্যেক শিশু বা ব্যক্তিকে তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মদক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা।
২. প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজের জন্মগত ও অর্জিত সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন করা এবং নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নয়নে তা কাজে লাগাতে উৎসাহিত করা।
৩. ব্যক্তির মধ্যে এমন এক মানসিকতার বিকাশ যার অনুপ্রেরণায় সে নিজস্ব কর্মক্ষেত্র ও কর্মের প্রতি ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠবে।

মানব সম্পদ উন্নয়নের উপরিল্লিখিত উদ্দেশ্য অর্জনে নিচের মানব সম্পদ উন্নয়ন কৌশলগুলো অবলম্বন করা যায়।

অতএব দেখা যাচ্ছে শিক্ষা মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রত্যেকটির মত পুরণে সক্ষম। তাই আধুনিককালে শিক্ষাকে মানব সম্পদ উন্নয়নের সামগ্রিক কৌশল বলা হয়।

১. সুক্ষল বায় (২০১১), শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষা দর্শন (পৃষ্ঠা ৪৭২-৪৮৬), কলকাতা।

২. নায়েম (২০১৬), প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল সিনিয়র স্টাফ কোর্স অন ম্যানেজমেন্ট, পৃষ্ঠা ২১৯-২২৭, ঢাকা।
৩. **কারিগরি শিক্ষা উন্নয়ন:** কারিগরি শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে দেশের যুব শক্তিকে উৎপাদনশীল ও দক্ষ নাগরিকে পরিণত করার লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রসারের জন্য মাদ্রাসাসহ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভোকেশনাল কোর্স চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। দেশ-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে বিভিন্ন ধরনের যুগোপযোগী ট্রেড ও টেকনোলজি কারিগরি শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করেছে।
৪. **শিক্ষা ক্ষেত্রে আইসিটি কার্যক্রম:** শিক্ষার যুগোপযোগী আইসিটি ব্যবহারের লক্ষ্যে ICT in Education Master Plan প্রণয়ন করা হয়েছে। সে অনুযায়ী শিক্ষা ক্ষেত্রটা ডিজিটালাইজ করার বিভিন্ন উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।
৫. সরকারের উন্নয়ন এজেন্ডার মূল অঙ্গিকার হচ্ছে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও মানব কল্যাণ। সরকার কর্তৃক স্বাস্থ্যখাতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এ খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা

আধুনিককালে শিক্ষাবিদগণ, শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে মানব সম্পদ উন্নয়নের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন। কারণ শিক্ষার প্রধান কাজ মানব সম্পদ উন্নয়ন করা। মানব সম্পদ উন্নয়নের যে সাধারণ কৌশলগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রতিটি শিক্ষা নির্ভর। যেমন মানব সম্পদ উন্নয়নের অন্যতম প্রধান সূচক হচ্ছে শিক্ষা। বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত ভালো স্বাস্থ্যভ্যাস গড়ে তোলা সম্ভব। এটি যেমন তাদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটায় তেমনি অর্জিত জ্ঞান অন্যদের মধ্যে সঞ্চালিত হয়ে তাদেরও স্বাস্থ্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে, যার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্ভব হয়।

মানব সম্পদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ব্যক্তির কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি। কর্মদক্ষতা বিকাশের জন্য ব্যক্তির জ্ঞান, দক্ষতার অনুশীলন এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। শিক্ষার মাধ্যমে এ তিনটা দিকই অর্জন করা সম্ভব হয়।

প্রত্যেক দিকই তার নিজস্ব সম্ভাবনা অনুযায়ী যখন উপযুক্ত কর্মে নিয়োগ হওয়ার সুযোগ পায়, তখনই সে তার ব্যক্তিগত সামর্থ প্রমাণ করতে পারে। তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশ মানব সম্পদ উন্নয়নের একটি কৌশল এ ক্ষেত্রে শিক্ষা বিশেষ করে সহায়তা করে। শিক্ষায় ও আইসিটির মানব সম্পদ উন্নয়নের আধুনিক কৌশলগুলো যেমন, প্রযুক্তির ব্যবহার, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি কোনভাবেই শিক্ষাকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়।

সর্বোপরি মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য যে Manpower Planning সে ক্ষেত্রেও শিক্ষার প্রত্যক্ষ না হলেও পরোপক্ষ প্রভাব রয়েছে। কারণ শিক্ষার ধরন, চাহিদা, সমাজ ও উৎপাদনমুখীতা, প্রয়োজনীয়তা, মান, ভবিষ্যতে গতিধারা ইত্যাদি বিবেচনা করেই এ ধরনের কর্মশক্তি পরিকল্পনা করতে হয়। তাই শিক্ষাকে অর্থবহ করে তোনার জন্য মানব শক্তির পরিকল্পনা প্রয়োজন। মানব সম্পদ পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতির দায়িত্ব শিক্ষাকেই গ্রহণ করতে হবে।

১. **স্বাস্থ্য রক্ষা কর্মসূচী:** সমাজের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তির স্বাস্থ্যের রক্ষা এবং উন্নতি সাধনে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা সৃষ্টি, খাদ্যের সুষম বণ্টন, মৃত্যুর হার হ্রাস, খাদ্য নিরাপত্তা সৃষ্টি ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তা করা যায়।
২. **সাক্ষরতা কর্মসূচী:** সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে কোন সমাজের অনগ্রসরতার মূল কারণ হলো নিরক্ষরতা। সাক্ষরতা মানুষের গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে তাকে উন্নয়নমুখী করে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে সব দেশে আয় কম, সেখানে নিরক্ষরের সংখ্যা বেশি। তাই জাতীয় সম্পদ উন্নয়নে সাক্ষরের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

৩. **দক্ষতাবৃদ্ধি কর্মসূচী:** ব্যক্তিকে সামাজিক সম্পদ হিসাবে পরিবর্তিত করার জন্য উপযুক্ত কর্মদক্ষতা অর্জনে সহায়তা করতে হবে। এ জন্য বিভিন্ন ধরনের উপযুক্ত পরিকল্পনা করতে হবে, যার মূল্য উদ্দেশ্য হতে দেশের সকল ব্যক্তিকে তাদের সম্ভাবনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা। এভাবে মানুষের ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারলে মানব সম্পদ উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।

৪. **কর্মক্ষেত্রে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী:** মানব সম্পদ উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। কর্মক্ষেত্রে একবারমাত্র প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্ভব নয়, তা টেকসই হবে না। কারণ সমাজের চাহিদা পরিবর্তনশীল, উৎপাদন কৌশল সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তিত হয়। তাই পরিবর্তিত পরিবেশের উপযোগী হয়ে গড়ে উঠতে হলে প্রয়োজন বিশেষধর্মী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী। কর্মকালীন বিশেষধর্মী প্রশিক্ষণ (On the Job Training) কার্যক্রম মানব সম্পদ উন্নয়নের একটি বিশেষ কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৫. **মানবশক্তি পরিকল্পনা:** ব্যক্তিকে সকল যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত কর্মে নিযুক্ত করতে না পারলে, তাকে সম্পদের স্তরে উন্নীত করা যাবে না। অর্থাৎ মানবশক্তিকে ব্যবহার করতে না পারলে সম্পদ সৃষ্টি সম্ভব নয়। তাই প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে নিজস্ব ক্ষমতা ও প্রশিক্ষণ অনুযায়ী কর্মে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ পায় তবে ব্যবস্থা করতে হবে। সমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যও চাহিদা বিবেচনার মাধ্যমে উপযুক্ত মানবশক্তির পরিকল্পনা (Man Power Planning) করার মাধ্যমে তা করা যায়।

মানব সম্পদ উন্নয়ন একটি জটিল প্রক্রিয়া এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিকল্পনা। উন্নয়ন কৌশলগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং কোনটিকে বাদ দিয়ে মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্ভব ন। বাংলাদেশ সরকার মানব সম্পদ উন্নয়নকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ বিভিন্ন উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করেছে। যেমন–

১. **শিক্ষার পুনর্গঠন ও শিক্ষা প্রযুক্ত:** সরকার শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। গ্রহণ করেছে রূপকল্প ২০১০ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ও কর্মমুখী শিক্ষার কর্মসূচী। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ গ্রহণের মাধ্যমে সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সাধারণ অর্থে যে জনসংখ্যা সামাজিক উৎপাদনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে তাকে কী বলে?
   ক. জনসম্পদ
   খ. রাষ্ট্রীয় সম্পদ
   গ. সামাজিক সম্পদ
   ঘ. মানব সম্পদ

২. মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রধান উদ্দেশ্য কয়টি?
   ক. দুইটি
   খ. চারটি
   গ. তিনটি
   ঘ. পাঁচটি

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. গ

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. মানব সম্পদ বলতে কী বুঝায়? মানব সম্পদের গুরুত্ব তুলে ধরুন।
২. মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা বর্ণনা করুন।
৩. মানব সম্পদ উন্নয়নের কৌশলগুলো ব্যাখ্যা করুণ।

পাঠ ৮.৫: গণমাধ্যম ও শিশু
Mass Media and Children

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- গণমাধ্যম কী তা বলতে পারবেন।
- শিশুর ওপর গণমাধ্যমের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

গণমাধ্যম (Mass Media)

গণমাধ্যমের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Mass Media'। গণমাধ্যম নামটি থেকেই এর অর্থ স্পষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ গণমানুষ বা জনগণের সঙ্গে যোগাযোগের যে মাধ্যম সেটাই গণমাধ্যম। জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের যে বাহন সেটাই হচ্ছে গণমাধ্যম। সে জনগণ শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সমাজের বসবাসকারী মানুষ। এদের সবার ওপরই গণমাধ্যম প্রভাব বিস্তার করে। সামাজিকীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো এই গণমাধ্যম। সমাজের সকল মানুষের সঙ্গেই গণমাধ্যম যোগাযোগ তৈরি করে। তবে শিশুরাই বেশি আকৃষ্ট হয় এই মাধ্যমটির প্রতি এবং শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠন ও বিকাশে এর ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। গণমাধ্যম হিসেবে পত্র-পত্রিকা, বেতার, টেলিভিশন, সিনেমা, ইন্টারনেট, পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদি বিবেচিত হয়। তবে গণমাধ্যমের সনাতন মাধ্যম হিসেবে যাত্রা, পালা, থিয়েটার, পুতুল নাচ, পটের গান এগুলোও বিবেচনায় আসে।

গণমাধ্যম ও শিশু (Mass Media and Children)

গণমাধ্যম সমাজের সকল মানুষকে তো বটেই, বিশেষভাবে শিশুদের ব্যক্তিত্ব গঠন ও বিকাশে এবং সামাজিকীকরণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। এই গণমাধ্যম অসম্ভব প্রভাব বিস্তারকারী একটি মাধ্যম যা শিশুর আচরণে ছাপ ফেলে। গণমাধ্যমের মাধ্যমে ব্যক্তি তথা শিশু নিজের সমাজ-সংস্কৃতিসহ সমগ্র বিশ্বের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। সমাজে কীভাবে চললে বা কোন ধরনের আচরণ করলে প্রশংসিত হওয়া যাবে কিংবা ঘৃণিত হওয়া যাবে ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা লাভ করা যায় গণমাধ্যম থেকে। এ ধরনের ধারণা লাভের ফলে ব্যক্তি বা শিশু সমাজ প্রত্যাশিত আচরণ শিখতে পারে ও প্রদর্শন করতে পারে। গণমাধ্যমের যেমন ইতিবাচক দিক আছে তেমনি নেতিবাচক দিকও আছে। ব্যক্তি বা শিশু গণমাধ্যম থেকে সমাজ প্রত্যাশিত আচরণ না শিখে বরং সমাজ-অপ্রত্যাশিত আচরণও শিখতে পারে এবং তা প্রদর্শন করতে পারে।

শিশুদের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাব সব চাইতে বেশি। তারা অতি দ্রুত প্রভাবিত হয়। এক্ষেত্রে যেমন ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার হয় তেমনি আবার অনেক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাবও বিস্তার লাভ করে। যেমন, বর্তমান বাংলাদেশে শিশুরা রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা, ইন্টারনেট জগতে বসবাস করে। তারা টিভিতে কার্টুন, বিজ্ঞাপন দেখে খুব আকৃষ্ট হয়। আর ইন্টারনেট তো এখন হাতের নাগালে। অনেক ভালো উপদেশ যা শিশুকে বলে শেখানো যায় না কিন্তু নাটক, সিনেমা বা বিজ্ঞাপনে দেখে তারা তা অনুকরণ করে রপ্ত করার চেষ্টা করে। ফলে শিশুর নতুন এক ধরনের সামাজিক শিক্ষা হয়, সামাজিকীকরণ ঘটে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'মীনা' নামে একটি কার্টুন দেখানো হয় যেটি শিশুরা অত্যন্ত পছন্দ করে। এই কার্টুনটিতে অনেক শিক্ষাণীয় বিষয় আছে যা শিশুরা সহজে শিখতে পারে। আবার অনেক বিজ্ঞাপন চিত্র আছে যা অত্যন্ত শিক্ষণীয় ও প্রণোদনা সৃষ্টিকারী শিশুদের জন্য। এভাবে সিনেমা, মঞ্চ নাটক, পথ নাটক, বিভিন্ন তথ্যচিত্র, প্রামাণ্য চিত্র, পুতুল নাচ ইত্যাদিতে

অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে যা দেখে শিশু ইতিবাচকভাবে উদ্দীপ্ত হতে পারে। শিশুর আচরণকে তা পরিবর্তন করে দিতে পারে। আবার উল্টোটিও অর্থাৎ নেতিবাচক সামাজিকীকরণও হয় গণমাধ্যমের মাধ্যমে। যেমন– টেলিভিশনের খবরে বা নাটক, সিনেমায় মারামারি দেখে কিংবা সিগারেট খাওয়া দেখে, নেশা করতে দেখে শিশু সেটিও অনুকরণ করতে পারে। আর ফেইসবুক ও ইন্টারনেটের অন্ধজগত তো শিশুর সামনে মোবাইল ফোনের কল্যাণে অবারিত। অভিভাবকরা যদি এগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ না করেন তবে শিশুদের ভালোর চেয়ে খারাপ হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা থাকে।

শিশুর ব্যক্তিত্বে ও সামাজিকীকরণে এসব গণমাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে খুব বেশি সময় নষ্ট হবে না। শিশুরা যেমন ভালো কিছু খুব দ্রুত শেখে তেমনি খারাপ কিছুও অতি দ্রুত আয়ত্ত করে। ফলে এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ অভিভাবকদের রাখতে হবে শিশুদের ওপর। গণমাধ্যমের বাহনগুলোর যেমন সুফল আছে তেমনি কুফলও আছে। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে। তারা অনভিজ্ঞতার কারণে ভালো-মন্দ নির্বাচন করতে পারে না। কাজেই অভিভাবকদের যেমন এক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে হবে তেমনি রাষ্ট্রেরও এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকতে হবে এসব গণমাধ্যমের ওপর। কী প্রচার করা যাবে আর কী প্রচার করা যাবে না তত্ত্বাবধান থাকতে হবে। তবেই সমাজ তার সুশৃঙ্খল পথে অগ্রসর হবে। সমাজস্থ মানুষর বিশেষ করে শিশুরা গণমাধ্যমের দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত হবে, লাভবান হবে এবং তাদের সঠিক সামাজিকীকরণ সম্পন্ন হবে। ফলে শিশুদের ব্যক্তিত্বের বিকাশও সঠিকভাবে হবে। এভাবেই গণমাধ্যম শিশুর ওপর প্রভাব বিস্তারকারী মাধ্যম হিসেবে ক্রিয়া করে এবং শিশুর আচরণের পরিবর্তন ঘটায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৮.৫

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. গণমাধ্যম শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ কোনটি?
   ক. Mass Media
   খ. Law Media
   গ. Global Media
   ঘ. Public Media

২. শিশুদের উপরে গণমাধ্যম কী ধরনের প্রভাব ফেলে?
   ক. ইতিবাচক
   খ. নেতিবাচক
   গ. দু'ধরনেরই
   ঘ. কোনটিই নয়

উত্তরমালা: ১. ক, ২. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. গণমাধ্যম কী?
২. গণমাধ্যমের বাহনগুলো কী কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. গণমাধ্যম শিশুর ওপর কী ধরনের প্রভাব বিস্তার করে তা ব্যাখ্যা করুন।
২. 'শিশু সামাজিকীকরণ গণমাধ্যম এক শক্তিশালী অনুঘটক'– মতামত দিন।

পাঠ ৮.৬: শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক ও গোষ্ঠিগত মিথষ্ক্রিয়া
Teacher-Student Relationship and Community Interaction

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক কেমন হবে তা বলতে পারবেন।
- একজন শিক্ষকের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবেন।
- গোষ্ঠিগত মিথষ্ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক

শিক্ষা শব্দটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে শব্দ দুটি তা হলো শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। তাই শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক কেমন হবে– এ প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে যত শ্রেণি ও পেশার মানুষ বাস করেন যেমন– ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, প্রধানমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী এমন কি রাষ্ট্র প্রধান পর্যন্ত সকলেই কোন না কোন শিক্ষকের কাছে শিক্ষা নিয়েই সমাজ গঠনে মনোনিবেশ করেছেন। শিক্ষক হচ্ছেন আলোকিত সমাজ গড়ার কারিগর। ব্যক্তি সমাজের ভেতরে বাস করে, সমাজকে বাদ দিয়ে জীবনের কোন অর্থ হয় না। আর সমাজ ব্যক্তিকে নিয়েই গড়ে ওঠে। কাজেই শিক্ষকের মহান দায়িত্ব হচ্ছে প্রথমে আলোকিত মানুষ গড়ে তোলা এবং তারাই গড়ে তুলতে পারে আলোকিত সমাজ। শিক্ষাকে সক্রিয়, সজীব, প্রাণবন্ত, আনন্দদায়ক ও জীবনমুখী করে তোলার কাজটি করেন শিক্ষক। পুরো শরীরের সাথে যদি শিক্ষককে তুলনা করা যায় তবে শিক্ষক হচ্ছেন তার মস্তিষ্ক। মাথাবিহীন শরীর যেমন অসাড় শিক্ষকবিহীন সমাজ তেমনি অসাড়। শিক্ষকের কাজই বলে দিচ্ছে তার স্থান সমাজে সর্বোচ্চ সম্মানজনক। কাজেই এই মহান পেশার অনুসারীকে অবশ্যই মানবিক গুণাবলীর বাস্তব রূপকার হতে হবে। যিনি আলো ছড়াবেন তাঁর অবশ্যই নিজস্ব আলো থাকতে হবে। সে জন্য একজন শিক্ষকের যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা দরকার তা হলো– সদালাপী, ন্যায়নিষ্ঠ, নিয়মানুবর্তী, ভাষাজ্ঞান ও বিষয় জ্ঞানে পারদর্শী কর্তব্য নিষ্ঠতা, সময়জ্ঞান ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক যদি সুন্দর না হয় তবে পুরো শিক্ষা প্রক্রিয়াই ব্যর্থ হবে। তাই শিক্ষককে সফল করতে হলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক উন্নত ও ইতিবাচক করতে হবে।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

১. শিক্ষক হবেন সদালাপী, হাস্যোজ্জল প্রাণবন্ত একজন মানুষ। যাকে দেখলেই শিক্ষাথীরা পরম আপন ও কাছের বন্ধু মনে করবে, আনন্দে উদ্বেলিত হবে। আবার শ্রদ্ধাও করবে, প্রাণের উচ্ছাস ও ভালবাসা উজার করে দেবেন। আন্তরিকতা ও ভালবাসায় শিক্ষকও থাকবেন সদা সচেতন। শিক্ষার্থীর পরম ভালবাসায় শিক্ষককে অনুসরণ করবেন।

২. জন ডিউই শিক্ষকের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, Education is the fundamental method of social progress and reforms the teacher is engaged, not simply ingraining individuals, but in the formation of the paper social life. যেহেতু শিক্ষা সমাজ সংস্কার ও সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে আদর্শ জাতি গঠনের একটি পদ্ধতি ও হাতিয়ার আর শিক্ষকই তা পরিচালনা

করেন। তাই শিক্ষকের কাজ হলো শিক্ষার্থীর দিকে দৃষ্টিপাত করা। কেননা আজকের শিক্ষার্থীই আগামীতে সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখবে। কাজেই তাদের মন মানসিকতা ও চিন্তনের মাঝে আদর্শের বীজ বপন করে দেবেন শিক্ষক।

৩. শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। শিক্ষকই দেশ ও সমাজ গঠনের কর্ণধার। তিনি যখন পাঠদান করবেন তখন অবশ্যই সেটা শিক্ষার্থী উপযোগী করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। সে জন্য প্রয়োজনীয় উপায়, উপকরণ ব্যবহার করবেন যাতে স্পষ্টভাবে শিক্ষার্থী তা বুঝতে সক্ষম হয়। শিক্ষার্থীরও উচিত শ্রেণিকক্ষে পুরোপুরি সহযোগিতা দেয়া ও মনোযোগী হওয়া।

৪. শিক্ষকের উচিত ভাল কাজে শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করা ও প্রেরণা দেয়া। একইভাবে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে তাদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তাদের উপযোগী করে শেখান। অবশ্য এ জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও শিক্ষকের নেয়া উচিত। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যিনি শিক্ষক হবেন, তাঁকে ছাত্র ও হতে হবে, শিক্ষক ছাত্রত্ব গ্রহণ করলে তারুণ্য নষ্ট হতে পারে না; বরং তিনি ছাত্রদের সুবিধা-অসুবিধা ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হবেন এবং তাদের মনের কাছাকাছি থাকবেন।

৫. একজন শিক্ষকের তুলনা একজন শিল্পীর সাথে করা যায়। শিক্ষকতা পেশাটাই এমন যে তাকে কোন নির্দিষ্ট ফ্রেমে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়। একজন শিল্পী তার মনের মাধুরী মিশিয়ে একটি শিল্পকার্য দাঁড় করান। শিক্ষক তেমনি শিক্ষার্থীকে শিক্ষা নামক বস্তুটিকে এমনভাবে অনুপ্রবেশ করাবেন যাতে করে শিক্ষার্থী তার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। শিক্ষার্থী যাতে নিজেকে যে কোন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং ভবিষ্যতে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের মান-মর্যাদাকে সমুন্নত রাখাও উজ্জল করতে পারে তা লক্ষ্য করা ও শিক্ষকের কাজ।

৬. শিক্ষার্থী মাত্রই শিক্ষকের কাছে সব ধরনের মূল্যবোধ সম্পর্কে শুধু ধারণা লাভ করবে তাই নয়, তাকে অনুশীলন, চর্চা ও বাস্তবায়নের কাজটিও শিক্ষকই শেখাবেন তাঁর পথ প্রদর্শক হিসেবে। শিশুদের সারা দিনের বেশীর ভাগ সময় কাটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, শিক্ষকের সংস্পর্শে। কাজেই গুরুজনকে শ্রদ্ধা করা, ছোটদেরকে স্নেহ, ভালবাসা দেয়াসহ নৈতিকতা ও ধার্মিকতার বিষয়েও শিক্ষকের ভূমিকা সব সময় অগ্রগণ্য। একজন শিক্ষক একজন পথ প্রদর্শক এবং অভিভাবকও বটে।

৭. বর্তমান শিক্ষা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। সে ক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব কমে যায়নি; বরং বেড়েছে। কেননা শিক্ষককে অবশ্যই শেখা ও শেখানোর ইচ্ছা দুটোই থাকতে হবে। শিক্ষার্থীর চাহিদা ও বয়স উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা ও তার বোধগম্যতা অনুযায়ী শিক্ষা দিতে হবে। তাছাড়া পরিবর্তনশীলতার মাঝে শিক্ষার্থী যাতে তালগোল পাকিয়ে না ফেলে সেদিকটিও লক্ষ্য রাখতে হবে।

৮. শিক্ষক মাত্রই হবেন সংস্কারক, সংগঠক ও পথপ্রর্দশক। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ করবেন ও দিক নির্দেশনা দেবেন। কোন শিক্ষার্থী কোন অপরাধ করলে বা পড়া না পারলে তাকে শারীরিক শাস্তি বা গালমন্দ দেয়া মোটেও ঠিক নয়। বরং তাদেরকে অবসর সময়ে ডেকে ভাল করে বোঝান ও বাবা-মার সাথে কথা বলে বাড়ির কাজ দেয়া এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান। এ ক্ষেত্রে শিক্ষককে অবশ্যই ধৈর্য্যশীল ও ধীরস্থির হতে হবে।

৯. শিক্ষার্থীদের কেবল সঠিক পাঠদান ও মূল্যবোধ শেখানই শিক্ষকের কাজ নয় শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসে আনন্দ পায় সে জন্য খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক, বিনোদনেরও ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মকাণ্ড প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন তাতে অংশগ্রহণ করে সে বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ যেমন- বন্যার্তদের পাশে দাঁড়ান, আত্মকর্মসংস্থানের জন্য কারিগরী শিক্ষায় উদ্বুদ্ধকরণ, শীতার্তদের শীতবস্ত্র দান করা ও আধুনিক প্রযুক্তিতে উদ্বুদ্ধ করা। প্রত্যেক শিক্ষার্থী মানব সম্পদে পরিণত হয় সে দিকে দৃষ্টিপাতি করা।

১০. বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করাও শিক্ষকের কাজ। যেমন- বর্তমান সমাজে জঙ্গিবাদ, মাদকাসক্তি, বেকারত্ব, ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ, ইফটিজিং ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে পর্যালোচনা করা এবং সচেতন করে তোলার জন্য উন্মুক্ত আলোচনার ব্যবস্থা করা।

১১. মোটকথা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কটা অত্যন্ত গভীর, ঘনিষ্ঠ ও মধুর একটা সম্পর্ক। পাঠ্যসূচিতেও সেই বিষয়গুলোই অন্তর্ভুক্ত হওয়া জরুরি। আলোকিত মানুষ গড়ার সাথে সাথে আলোকিত সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে সক্ষম হবেন শিক্ষক। শিক্ষক হবেন আদর্শের মডেল, মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী। মনে রাখতে হবে পুঁথিগত বিদ্যা কেবল জ্ঞান দিতে পারে, সত্যিকারের মানুষ নয়। সত্যিকারের মানুষ তৈরি করেন শিক্ষক। তাই শিক্ষককে হতে হবে মানবীয় গুণে গুণান্বিত আদর্শ মানুষ যাকে অনুসরণ, অনুকরণ করে শিক্ষার্থীরা হবেন আদর্শের বাস্তব রূপকার। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভার যাতে পূর্ণ বিকাশ ঘটে সে পরিবেশ তৈরি করে শিক্ষক আলোকিত মানুষ গড়বেন।

গোষ্ঠীগত মিথষ্ক্রিয়া (Social Interaction)

মানুষের কাছে সমাজ জীবন হল স্বাভাবিক ও অপরিহার্য। কোন স্বাভাবিক মানুষের পক্ষেই সমাজ বহির্ভূতভাবে বসবাস করা সম্ভব নয়। সমাজে বাস করে মানুষ বিভিন্ন সংঘ-সমিতি ও গোষ্ঠী গড়ে তোলে। এবং এই গোষ্ঠী ও সংঘ-সমিতির মাধ্যমে সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন অতিবাহিত হয়। প্রত্যেকটি সামাজিক গোষ্ঠীরই নির্দিষ্ট কিছু বিধি-নিয়ম আছে। গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে মানুষকে গোষ্ঠী-নির্দিষ্ট সেই নিয়মাবলী মেনে চলতে হয়। তাই গোষ্ঠীর মধ্যে মানুষের আচরণ খেয়াল খুশীমত হতে পারে না। তাকে আচার-আচরণের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট ধারা বা ছক অনুসরণ করে চলতে হয়। সমাজে একজন ব্যক্তির আচরণ অন্যান্যদের আচরণকে যেমন প্রভাবিত করে তেমনি অন্যান্যদের ব্যবহারের দ্বারাও প্রত্যেক ব্যক্তি প্রভাবিত হয়। আচরণগত এই পারস্পরিক প্রভাব-প্রতিক্রিয়াই হল মিথষ্ক্রিয়া (Interaction)। সমাজ জীবনের মূল বিষয় হল এই 'মিথষ্ক্রিয়া'। সমাজ জীবনে সামাজিক আচার-ব্যবহারের যে ধারা পরিলক্ষিত হয় তা গড়ে উঠে এই সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার ভিত্তিতেই। এই কারণে বলা হয় বেশ কিছু সংখ্যক মানুষের সমাবেশকেই সমাজ বলা হয় না। সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার ভিত্তিতে সৃষ্টি হয় সমাজের।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক বিদ্যাভুষণ ও সচদেব মন্তব্য করতে গিয়ে যা বলেন তা হলো–

"An aggregate of individuals becomes a society not because each individual possesses 'its content' which actuates him, but because there is a reciprocal influence direct or indirect. Social interaction produces some definite influence upon such relations that exist among human-beings".

এই প্রসঙ্গে George Simmel বলেন– "Society exists wherever several individuals are in reciprocal relationships and that which constitutes an aggregation of individuals into a society is not their life content, but there reciprocal influences".

সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মানসিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া হল এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ পরস্পরের মনোরাজ্যের পরিচয় পায়। ডসন ও গেটিজ (Daswson & Gethys) তাঁদের An Introduction to Sociology শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: "Social interaction is a process where by men interpenetrate the minds of each other". সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক বর্তমান থাকে তা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় এই সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার দ্বারা। বস্তুতঃ সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া বলতে সামাজিক সম্পর্কের এক সম্পূর্ণ পরিমণ্ডলকে বোঝায়। এই পরিমণ্ডলের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।

Fundamentals of Sociology শীর্ষক গ্রন্থে N. P. Gish সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন- "Social interaction is the reciprocal influence human beings exert on each other through interstimulation and response". এ প্রসঙ্গে A. W. Green-এর অভিমতও প্রণিধানযোগ্য। ("Social interaction is) the mutual influences that individuals and groups have on one another in their attempts to solve problems and in their striving towards goals".

সামাজিক সংস্পর্শ ও যোগাযোগ

সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির হতে পারে, আবার এই মিথষ্ক্রিয়া গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর হতে পারে। এ প্রসঙ্গে পার্ক ও বার্জেস (Park and Burges) তাঁদের Introduction to the Science of Society শীর্ষক গ্রন্থে বলেন– "Social interaction is of a dual nature of persons with persons and of groups with groups".

সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার দুটি মূল শর্ত বর্তমান। এই দুইটি শর্ত হল: (১) সামাজিক সংস্পর্শ এবং (২) যোগাযোগ। সামাজিক সংস্পর্শ হল সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার প্রাথমিক শর্ত। Gillin and Gillin তাঁদের Cultural Sociology শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন- "Social contact is the first phase of interaction". এই সামাজিক সংস্পর্শ এবং কায়িক বা দৈহিক সংস্পর্শ সমার্থক নয়। সামাজিক সংস্পর্শ স্থাপনের জন্য দৈহিক নৈকট্য বা কায়িক সংস্পর্শের প্রয়োজন হয় না। ডাক ও তার, বেতার, ফেসবুক, ই-মেইল বা অন্য প্রযুক্তি প্রভৃতি যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে দূরদূরান্তে বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গের মধ্যেও সামাজিক সংস্পর্শ স্থাপিত হওয়া সম্ভব। তবে দৈহিক সংস্পর্শের মাধ্যমে সামাজিক সংস্পর্শ অধিকতর দৃঢ় হয় যাতে দ্বিমতের অবকাশ নাই।

ইতিবাচক ও নেতিবাচক সামাজিক সম্পর্ক

প্রকৃত পক্ষে সামাজিক সংস্পর্শ স্থাপিত হয় ইন্দ্রিয়ানুভুতির মাধ্যমে। সামাজিক সংস্পর্শ স্থাপনের জন্য একটি অপরিহার্য বিষয় হল যোগাযোগের মাধ্যম। কোন একটি বস্তু বা বিষয়ের সঙ্গে মাধ্যম বিশেষের সাহায্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যোগাযোগ স্থাপিত হলে সংশ্লিষ্ট বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হওয়া যায়। মানবিক মিথষ্ক্রিয়া মূলত যোগাযোগমূলক। যোগাযোগের মাধ্যম বহু ও বিভিন্ন। যেমন- ভাষা, লিপি, সংবাদপত্র, ডাক ও তার, রেডিও, টেলিফোন, প্রতীক প্রভৃতি। সামাজিক সংস্পর্শ দু'ধরনের হতে পারে। সামাজিক সংস্পর্শ ইতিবাচক (Positive) হতে পারে, আবার তা নেতিবাচক (Negative) হতে পারে। যদি সংস্পর্শ সূত্রে সহযোগিতা পারস্পরিক বোঝাপড়া পরোপকার প্রভৃতির সৃষ্টি হয়, তাহলে তাকে বলে ইতিবাচক সামাজিক সংস্পর্শ। কিন্তু বিপরীতক্রমে যখন এই সংস্পর্শ থেকে হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়, তখন তা হল নেতিবাচক সামাজিক সংস্পর্শ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৬

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষক হলেন সকল মানবিক গুণের–
   ক. বাস্তব রূপকার
   খ. আধার
   গ. সমাহার
   ঘ. কেন্দ্র

২. শিক্ষা তখনই সফল হবে যখন শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্ক হবে–
   ক. গভীর
   খ. মানবিক
   গ. সহজ-সাবলীল
   ঘ. উন্নত ও ইতিবাচক

৩. সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার মূল শর্ত কয়টি–
   ক. একটি
   খ. দুইটি
   গ. চারটি
   ঘ. তিনটি

উত্তরমালা: ১. ক, ২. ঘ, ৩. খ

খ. সংক্ষিপ্তমূলক প্রশ্ন

১. ইতিবাচক ও নেতিবাচক সামাজিক সম্পর্ক বলতে কী বুঝায়?
২. গোষ্ঠীগত মিথষ্ক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।
৩. সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া বলতে কী বুঝায়?

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন মতামত দিন।
২. একজন শিক্ষকের গুণ ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরুন।
৩. সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া বলতে কী বুঝায় ব্যাখ্যা করুন।
৪. সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার শর্ত হিসেবে সামাজিক সংস্পর্শ ও যোগাযোগ এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৮.৭ শিক্ষকতা পেশা
Teaching Profession

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পেশা বলতে কী বুঝায় বলতে পারবেন।
- পেশা হিসেবে শিক্ষকতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষকের পেশাগত দায়িত্ব পালনের উপযোগী গুণাবলি চিহ্নিত করতে পারবেন।
- শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।

পেশা

পেশার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Profession' যা দ্বারা জীবন-জীবিকার জন্য নিয়মিত যে কাজ করা হয় তাকে বুঝান হয়। 'John J. Maciouis (১৯৯২) পেশা সম্পর্কে বলেন "A profession is a prestigious white colour occupation that requires extensive formal education. The term suggested a profession on public declaration of willingness to abide by certain principles".

সামাজিক বিজ্ঞানের অভিধান (১৯৮৩) অনুযায়ী 'পেশা হচ্ছে নৈপুণ্যভিত্তিক বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বৃত্তি'। A. E. Benn তাঁর The Management Dictionary গ্রন্থে বলেন– পেশা হচ্ছে এমন একটি সেবা বা জীবিকা যার জন্য একজন পেশাজীবিকে অন্যকে শিক্ষাদান, নির্দেশনা বা উপদেশ প্রদানের জন্য বিশেষায়িত জ্ঞান অর্জন করতে হয়।

সুতরাং পেশা বলতে নির্দিষ্ট দক্ষতা, নৈপুণ্য ও মর্যাদাসম্পন্ন সেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতবদ্ধ বিশেষ কাজকে বুঝায় যার নিজস্ব কিছু মানদণ্ড আছে এবং যা বৃত্তি হতে স্বতন্ত্র। বৃত্তি বলতে কেবল কায়িক শ্রমযুক্ত কাজকে বুঝায়। যেমন চাষাবাদ, কুলিগিরি। কিন্তু পেশা একটি সার্বক্ষণিক কর্ম যার জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ বা শিক্ষার প্রয়োজন হয়।

পেশার সর্বজনস্বীকৃত কিছু বৈশিষ্ট্য বা মানদণ্ড আছে। যেমন–

১. নিজের পেশা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ও যোগ্যতা;
২. পেশাগত নৈপুণ্য এবং দক্ষতা;
৩. জনকল্যাণমুখীতা;
৪. পেশাদারী সংগঠন;
৫. পেশাগত দায়িত্ববোধ;
৬. বিশেষ মূল্যবোধ;
৭. নীতি নৈতিকতা;
৮. পেশাগত কর্তৃপক্ষ; এবং
৯. সামাজিক স্বীকৃতি। শিক্ষকতা এ সকল বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটি মহান পেশা।

শিক্ষকতা পেশার গুরুত্ব

শিক্ষকতা একটি প্রাচীনতম পেশা। শিক্ষকের পেশাগত দায়িত্ব যথাযথ পালনের উপর নির্ভর করে ব্যক্তি, গৃহ, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্র এবং সভ্যতার উপযুক্ত বিকাশ ও উন্নয়ন। শিক্ষকই হচ্ছেন ভবিষ্যতে উন্নয়নের সবচেয়ে বড় কর্মকার। তার উপরই নির্ভর করে শিক্ষার গুরুদায়িত্ব। শিক্ষকের কাজ হচ্ছে শিক্ষাদান করা। এটি একদিকে যেমন তার একটি দায়িত্ব, তেমনি দেশের উন্নয়নে কাজ করার একটি বিশাল সুযোগ। তাই শিক্ষকতাকে কেবল অর্থ উপার্জনের একটি মাধ্যম হিসেবে ভাবলেই হবে না বরং শিক্ষকতা মানব সভ্যতার সকল কর্মকাণ্ডের মধ্যে সর্বোত্তম ও মহান পেশা। সব সুযোগের মধ্য বড় সুযোগ এবং একটি পবিত্র দায়িত্ব। সুতরাং এ কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই তার পেশাকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে পালন করতে হবে। যারা এ দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও মনোভাব অর্জন করবে না তাদের কোনভাবেই শিক্ষকতা পেশায় আসা উচিত নয়।

শিক্ষকের কাজ ও ভূমিকা

শিক্ষতার কাজটি সঠিকভাবে পালন করতে হলে শিক্ষককে বেশকিছু দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করতে হবে। নিচের ছকে তা দেখ যেতে পারে।

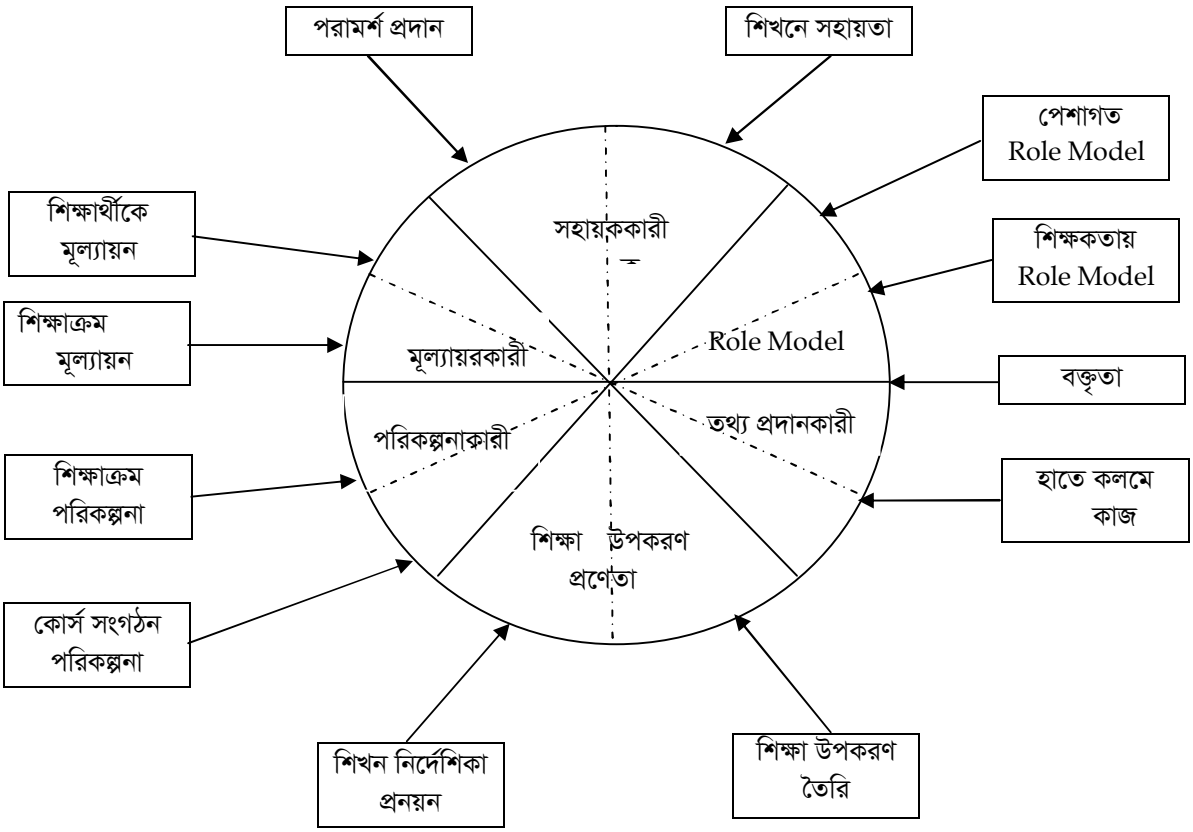

মুখোমুখি ও দূরশিক্ষণ শিক্ষার উভয় ক্ষেত্রের শিক্ষককে এ দায়িত্বগুলো পালন করতে হবে।

শিক্ষকের গুণাবলি

শিক্ষকতা একটি কলা (Art)। এটি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন ত্যাগ, পেশাগত ইতিবাচক মনোভাব, রসাত্মবোধ, গভীর আস্থা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, গভীর শ্রম ইত্যাদি গুণাবলি। পেশাগত দায়িত্বের প্রতি ন্যায়বিচার করতে হলে শিক্ষককে অবশ্যই এগুলো অর্জন করতে হবে। এজন্য শিক্ষকের নিম্নোক্ত গুণাবলী থাকা আবশ্যক। যথা–

১. শিক্ষাদানের বিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও ধারণা।
২. শিশুর প্রকৃতি অর্থাৎ মানসিক চাহিদা ও বিকাশ সম্পর্কে ধারণা। কোন বিষয়গুলো শিশুর জ্ঞান, অভ্যাস, দক্ষতা, সামর্থ ও আগ্রহের উন্নয়নে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে অবশ্যই জানতে হবে।
৩. শিক্ষণীয় বিষয়ের শিক্ষাক্রম সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা থাকতে হবে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দ্বারা পেশাগত দক্ষতা অর্জন করতে হবে।
৪. শিক্ষকতার সনাতন ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে হবে। গতানুগতিক পাঠদান পদ্ধতির পরিবর্তে গবেষণার ভিত্তিতে উদ্ভাবিত নবতর ও ফলপ্রসূ শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহারে মনোযোগী ও দক্ষ হতে হবে। তার শিক্ষাদান পদ্ধতি হতে হবে অনুসন্ধানমূলক ও প্রায়োগিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে দক্ষতা থাকতে হবে।
৫. শিক্ষার্থীদের সাথে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। এছাড়া তাদের প্রতি সহানুভূতি, ধৈর্য ও ভালোবাসা থাকবে এবং এই ভালোবাসা হতে হবে স্বার্থহীন ও প্রকৃত।
৬. শিক্ষকের অবশ্যই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব থাকবে। শিক্ষার্থীর সাথে থাকবে ভালো বোঝাপড়া। থাকবে ভালো যোগাযোগ দক্ষতা।
৭. যৌক্তিকভাবে চিন্তা করার দক্ষতা থাকবে।
৮. শিক্ষককে স্বার্থপরতা পরিহার করতে হবে এবং অন্যাদের ভালো করার মানসিকতার অধিকারী হতে হবে।
৯. শিক্ষককে পেশাগত উন্নয়নের প্রত্যাশা এবং সে লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা থাকবে। তাকে স্থবিরভাবে একই পথে না চলে নতুন কিছু গ্রহণ করার মানসিকতা রাখতে হবে। প্রতিনিয়ত পেশাগত দায়িত্ব পালন ও উন্নয়নের অধিকতর ফলপ্রসূ উপায় বের করতে হবে এবং তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে।
১০. শিক্ষকতা পেশার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব থাকতে হবে। তার নিজ পেশার জন্য গর্ব অনুভব করতে হবে। শিক্ষকতাকে কেবল জীবন ধারণ বা অর্থ উপার্জনের উপায় হিসেবে দেখলে হবে না। করতে হবে নিজ পেশার প্রতি ন্যায়বিচার।
১১. সহকর্মী, শিক্ষার্থী, সমাজ সকলের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব থাকতে হবে। শিক্ষক অবশ্যই সকলের সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে তার পেশাগত দায়িত্ব পালন করবে।
১২. নিজস্ব পেশার Code of Conduct বা নৈতিকতা মেনে চলতে হবে।

শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন কৌশল

শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর। আর শিক্ষাদান করা একটি উৎকৃষ্ট ইবাদত। এটি সর্বোত্তম সেবা এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পেশা। তাই পেশাগত দায়িত্ব সর্বোৎকৃষ্টভাবে পালনের জন্য অবশ্যই তার পেশার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এজন্য ত্রিমুখী কৌশল অবলম্বন করতে হবে। এগুলো হলো–

১. শিক্ষকের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা;
২. শিক্ষকদের সম্মিলিত চেষ্টা এবং
৩. সরকারি পদক্ষেপ।

১. শিক্ষকের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা

নিজের পেশাগত উন্নয়নের জন্য সর্বাগ্রে শিক্ষক নিজে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। যেমন–

- নিজের শিক্ষাদানের বিষয় সম্পর্কে আধুনিক ধারণা অর্জনে সচেষ্ট থাকবেন।
- শিক্ষা বিজ্ঞান ও এক্ষেত্রে উদ্ভাবিত নতুন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবেন।
- দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পেশাগত শিক্ষা ও স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন।
- শিক্ষক হবেন একজন জীবনব্যাপী শিক্ষার্থী। তিনি নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের জন্য সব সময় পড়াশুনা করবেন।
- জাতীয় শিক্ষানীতি ও জাতীয় শিক্ষাক্রম সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা রাখবেন এবং সে অনুসারে দায়িত্ব পালনের মানসিকতা রাখবেন।
- আধুনিক মূল্যায়ন পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করবেন।
- পেশার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী হবেন ও শিক্ষার্থীদের সাথে পেশামূলক আচরণ করবেন।

২. শিক্ষকগণের সম্মিলিত চেষ্টা

- শিক্ষকগণ পারস্পরিক আলোচনা ও সহযোগিতার মাধ্যমে পেশাগত উন্নয়ন ঘটাবেন।
- একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকগণ নিজের পেশাগত উন্নয়নে মতবিনিময় সভা ও প্রশিক্ষণ আয়োজন করবেন।
- বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতা অন্যান্য শিক্ষকদের মাঝে বিতরণ করবেন।
- পেশা হিসেবে শিক্ষকতাকে সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবেন।
- শিক্ষকতাকে মর্যাদাশীল ও সেবামূলক পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর থাকবেন।
- পেশাদারী সংগঠন তৈরির মাধ্যমে নিজেদের উন্নয়নের চেষ্টা করবেন।

৩. সরকার ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

- সরকার ও বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, শিক্ষামূলক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজন করবেন।
- বিভিন্ন দেশে শিক্ষা সফর ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি।
- শিক্ষক নিবন্ধন ও নিয়োগের উপযুক্ত নিয়ম তৈরি।
- শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের আনুষ্ঠানিক সুযোগ বা সিঁড়ি (Carrier Lodder) সৃষ্টি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৭

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোনটি পেশার সাথে সম্পর্কিত নয়?
   ক. বিশেষায়িত জ্ঞান
   খ. পেশাগত দায়িত্ববোধ
   গ. জনকল্যাণমুখীতা
   ঘ. কায়িক শ্রম

২. মানব সভ্যতার সকল কর্মকান্ডের মধ্যে সর্বোত্তম ও প্রাচীনতম পেশা কোনটি?
   ক. চাষাবাদ
   খ. শিক্ষকতা
   গ. উকিল
   ঘ. ডাক্তারী

৩. পেশাগত উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষক ব্যক্তিগত পর্যায়ে কী উদ্যোগ গ্রহণ করবেন?
   ক. পদোন্নতির ব্যবস্থা করা
   খ. পেশাদারী সংগঠন তৈরি
   গ. মতবিনিময় ও প্রশিক্ষণ আয়োজন
   ঘ. নিজের শিক্ষাদানের বিষয়ে আধুনিক ধারণা অর্জন

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. খ, ৩. ঘ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. পেশা কী?
২. পেশার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
৩. শিক্ষাকতা পেশার গুরুত্ব কী?
৪. শিক্ষকতা পেশার নৈতিকতা রক্ষায় শিক্ষকের করণীয় ৫টি কাজ উল্লেখ করুন।
৫. পেশাগত উন্নয়নে শিক্ষা ব্যক্তিগত পর্যায়ে কী উদ্যোগ গ্রহণ করবেন?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ছকের সাহায্যে শিক্ষকের দায়িত্ব ব্যাখ্যা করুন।
২. শিক্ষকের গুণাবলি বর্ণনা করুন।
৩. শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন কৌশল বর্ণনা করুন।
৪. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিক্ষকদের ও পেশাগত দায়িত্ব পালনের বর্তমান অবস্থা মূল্যায়নপূর্বক অবস্থার উন্নয়নে আপনার সুপারিশ উল্লেখ করুন।

পাঠ ৮.৮ সামাজিক সমস্যাবলী ও শিক্ষা
Social Problems and Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সামাজিক সমস্যা বলতে কী বুঝায় বলতে পারবেন।
- কিছু সামাজিক সমস্যার কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষার সাথে সামাজিক সমস্যার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সামাজিক সমস্যা রোধে শিক্ষার ভূমিকা নিরূপন করতে পারবেন।

সামাজিক সমস্যা (Social Problem)

কোন সমাজই সমস্যাযুক্ত নয়। বিশ্বের সব সমাজেই সামাজিক সমস্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। সামাজিক বিবর্তনের ধারায় নানাবিধ কারণে মানব আচরণের সহজ সরল বৈশিষ্ট্যগুলো ক্রমশ লোপ পেয়ে জটিলতর সমস্যা তৈরি হচ্ছে, যা সুস্থ সামাজিক জীবনযাপনের জন্য বিরাট হুমকি। বাংলাদেশও এ সব সমস্যায় আক্রান্ত।

সামাজিক সমস্যার ধারণা ও প্রকৃতি (Nature of Social Problem)

সামাজিক সমস্যা বলতে এমন একটি পরিস্থিতি বা অবস্থা বুঝায় যা সমাজের সদস্যদের দৃষ্টিতে সমাজের জন্য হুমকিস্বরূপ বলে মনে করা হয়। এসব কাজ সমাজের জন্য অনাকাঙ্খিত এবং অনভিপ্রেত। এগুলো সমাজের সদস্যদের জীবনকে নৈতিবাচক নানাভাবে প্রভাবিত বা জর্জরিত করে। ফলে সমাজবাসীরা যৌথ প্রয়াসের মাধ্যমে ঐ সব সমস্যা সমাধানের মানসিকতা পোষণ করে এবং সে লক্ষ্যে কাজ করে। তবে সমাজের কোন কোন অবস্থা বা পরিস্থিতিকে সামাজিক সমস্যা বলে বিবেচনা করা হবে তা একটা আপেক্ষিক বিষয়। অনেক সময় এক সমাজের জন্য যা সমস্যা বলে বিবেচিত, অন্য সমাজে তা সমস্যা নাও হতে পারে। আবার এক যুগে যা সমস্যা মনে করা হয় পরবর্তীতে তাকে সমস্যা নাও বলা যেতে পারে। আজ যা সমস্যা নয়, সেটাই পরবর্তীতে অবস্থায় সমস্যা বলে চিহ্নিত হতে পারে। এমন কিছু পরিস্থিতি আছে যা বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের জন্যই সামাজিক সমস্যা বলে মনে করা হয়।

নিচে এ ধরনের কয়েকটি সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. দারিদ্র (Poverty)

এটি বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর একটি বড় সমস্যা যা সমাজের গভীরে প্রথিত। বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। দারিদ্র্যের কারণে পরিবারের সন্তানেরা প্রয়োজনীয় শিক্ষার সুযোগ পায় না। উপযুক্ত গৃহ পরিবেশ, স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হয়, মানসম্পন্ন জীবনযাত্রা নির্বাহ করা সম্ভব হয় না। নিরক্ষরতা, বেকার সমস্যা, গতানুগতিক কৃষি, জনসংখ্যাধিক্য, সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতার অভাব ইত্যাদি কারণে দারিদ্র দেখা দেয়। এর ফলে অনেকে অপরাধমূলক কর্মের সাথে জড়িত হয়ে যায়। বর্তমানে দরিদ্র বিমোচনে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হচ্ছে। বাংলাদেশের সরকারও এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

হলে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দারিদ্র বিমোচনে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং দারিদ্রের হার কমছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে হলে সমান থেকে দারিদ্রকে অবশ্যই দূর করতে হবে।

২. নিরক্ষরতা (Iliteracy)

বাংলাদেশসহ অনেক দেশই এ সমস্যায় জর্জরিত। নিরক্ষর বলতে সেই ব্যক্তিকে বুঝায়– যার কোন অক্ষর জ্ঞান নেই। নিজের নাম পর্যন্ত লিখতে পারে না। আবার কেউ কেউ নিজের নাম লিখতে পারলেও কোন কিছু পড়ে বুঝতে পারে না। বাংলাদেশে শতকরা প্রায় ৩৭ ভাগ লোক নিরক্ষর। দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে নিরক্ষরতার হার খুবই বেশি। নিরক্ষরতা অভিশাপ থেকে মানব জাতিকে মুক্তি করার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এ অভিশাপ থেকে রাষ্ট্র মুক্ত হয় নাই। দারিদ্র, অসচেতনতা, সামাজিক বৈষম্য ইত্যাদি কারণে নিরক্ষরতা দেখা দেয়। নিরক্ষরতার সাথে অপরাপর সামাজিক সমস্যাগুলো ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

৩. কিশোর অপরাধ (Juvenile Delinquency)

সহজ কথায় সমাজ কর্তৃক অসমর্থিত অথচ কিশোর কর্তৃক সংঘটিত কাজই হলো কিশোর অপরাধ। সাধারণত ৮ থেকে ১৭ বছরের কোন ব্যক্তির অপরাধকে কিশোর অপরাধ বলা হয়। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে কিশোর অপরাধী হচ্ছে সেই কিশোর যে তার নিজের আচরণকে সঠিক বলে বিবেচনা করে এবং তার কৃতকর্মের দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিনা তা বিচার করতে ব্যর্থ হয়। এ ধরনের কিশোর অপরাধীরা মানসিকভাবে চঞ্চল থাকে, পারিপার্শ্বিক সামাজিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে ব্যর্থ হয় এবং সমাজ বিরোধী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে। ফলে ব্যক্তির নিজের ও সমাজের ক্ষতি হয়। কিশোর অপরাধ হ্রাস করতে হলে পারিবারিক পরিবেশকে শিশুদের সুষ্ঠু বিকাশের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। চিত্তবিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং শিশুরা যেন অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলে সেটার প্রতি মা-বাবা, অভিভাবকদের খেয়াল রাখতে হবে। তাদের সমাজের সাথে খাপ খাওয়ানোর দক্ষতা বাড়াতে হবে। প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ করতে হবে। আইন শৃঙ্খলার যথাযথ প্রয়োগ ঘটাতে হবে। সামাজিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে হবে।

৪. নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা (Violence Against Women)

নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ সংক্রান্ত জাতিসংঘ ঘোষণা- ১৯৯৩ অনুযায়ী নারীর প্রতি সহিংসতা হচ্ছে– নারীর প্রতি যে কোনো ধরনের দৈহিক, মানসিক, জৈবিক নির্যাতন বা ক্ষতিসাধন। এমনকি হুমকি প্রদান যার ফলে ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনের স্বাধীনতা বা নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। নারীর প্রতি সহিংসতা আজ বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত, সমাজের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়া একটি সামাজিক ব্যাধির নাম। নারীর ওপর নির্যাতন সুদূর অতীত থেকে চলে আসছে এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে নির্যাতিত হচ্ছে নারী। ধর্ষণ, গণধর্ষণ, এ্যাসিড নিক্ষেপ, শারীরিক নির্যাতন, হত্যা, আত্মহত্যার প্ররোচনা, পারিবারিক নির্যাতন ইত্যাদি আমাদের সমাজে সংঘঠিত নারী নির্যাতনের ধরন। এছাড়াও রয়েছে ইভটিজিং, যৌন হয়রানী, যৌতুক, বাল্য বিবাহ, স্বামী কর্তৃক পরিত্যাক্ত, বহুবিবাহ, বিবাহবিচ্ছে ইত্যাদি। নারী শিক্ষার নিম্নহার, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, নারী-পুরুষের বৈষম্য, নারীর ক্ষমতায়নের অভাব, অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা, সামাজিক লোকলজ্জার ভয়, আত্মসচেতনতার অভাব, অপরাধ, আইন শৃঙ্খলা ও প্রয়োগের অভাব, বিচার কার্যে জটিলতা, মিডিয়ার নেতিবাচক প্রভাব ইত্যাদি কারণে এ ধরনের সহিংসতার ঘটনা ঘটছে।

৫. যৌতুক (Dowry)

সাধারণ কথায় বলা যায় মেয়ের মঙ্গল প্রত্যাশা করে বাবা-মা মেয়ের হবু স্বামীকে বিয়ের সময় যে উপঢৌকন দেয় বা দিতে বাধ্য হয় সেটাই হল যৌতুক। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যৌতুক আর্শীবাদ না হয়ে অভিশাপে পরিণত হয়। অর্থাৎ হীতে বিপরীত হয়। মেয়ের পরিবার প্রত্যাশা চুক্তি অনুযায়ী যৌতুক দিতে ব্যর্থ হলে মেয়েকে অনেক

সময় পারিবারিক নির্যাতনের স্বীকার হয়। এর ফলে মেয়ের জীবন, পরিবার ও সমাজের উন্নয়নের এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। যৌতুক আমাদের সমাজের একটি ব্যাধি। প্রতি বছর হাজার নারী যৌতুক সংশ্লিষ্ট নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা যায়, পঙ্গু হয়। এটি নারীর সামাজিক অবস্থানকে নিম্নমুখী করে।

৬. মাদকাশক্তি (Drug)

মাদকাশক্তি বাংলাদেশের একটি ক্রমবর্ধমান সমস্যা। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ লোক মাদকাশক্ত এবং এদের বেশির ভাগই বয়সে তরুণ মাদকাশক্তির। মাদকাশক্তি সরাসরি দেশের অর্থনীতি ও সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করে। পরিবারের অশান্তি, বন্ধুদের প্রভাব, বেকার সমস্যা, ভালোবাসায় প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় সৃষ্ট মানসিক চাপ ইত্যাদির প্রধান কারণ। মাদকের কারণে আসক্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্যসহ সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। এ কারণে বর্তমানে আমাদের সমাজে হাইজ্যাকিং, চাঁদাবাজি, চুরি, ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, নৈতিকতার অবক্ষয় ইত্যাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাদকাশক্তির কারণে অনেকে শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ে যা মানব সম্পদ উন্নয়নের একটি্ বড় প্রতিবন্ধকতা।

৭. তালাক (Divorce)

তালাক হচ্ছে বিবাহ ভাঙ্গার বা বিয়ে বাতিল করার একটি বৈধ উপায়। বাংলাদেশে ইদানিং এটি একটি বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে এবং দিন দিন তালাকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংসারকে টিকিয়ে রাখার জন্য স্বামী-স্ত্রীর ইতিবাচক সম্পর্ক এবং মানসিক দৃঢ়তা একটি সুখি পারিবারিক জীবনের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় ঘটছে যার প্রত্যক্ষ ফলাফল হচ্ছে ক্রমবর্ধমান তালাকের সংখ্যা বৃদ্ধি। দরিদ্র, নিরক্ষর, অল্প শিক্ষিত, ভাসমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে তালাকের হার আর বেশি। উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যেও এর হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তালাকের একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়ে আলাদা হয়ে যাওয়া স্বামী-স্ত্রীর উপর এবং বিশেষ করে সন্তানদের উপর, যার ফলে তারা লেখাপড়া ছেড়ে দেয় বা দিতে বাধ্য হয় এবং জড়িয়ে পরে বিভিন্ন অপরাধী কর্মকাণ্ডে।

৮. বস্তি সমস্যা (Slum)

বাংলাদেশ মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশের বেশি লোক শহরে বাস করে। এই সংখ্যা প্রতি বছর ৩.৫% হারে বাড়ছে। সাধারণত গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠী নদী ভাঙ্গন কবলিত মানুষ প্রাথমিকভাবে শহরে বেশি স্থানান্তরিত হয়। অস্বচ্ছলতার কারণে প্রথমে তারা বস্তিতে অবস্থান নেয়। বস্তির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নিরাপত্তহীনতা ও সুযোগ-সুবিধার অভাবের কারণে সন্তানদে লেখাপড়া বিঘ্নিত হয়। ফলে সেখানে স্বাক্ষরতার হার অনেক কম। ১৯৯১ সালে আদম শুমারী অনুযায়ী ১৪.৬৬% বস্তিবাসী স্বাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন যা জাতীয় স্বাক্ষরতার হারের চেয়ে অনেক কম। এদের আয় রোজগারের আনুষ্ঠানিক সুযোগ খুব কম হওয়ায় পরিবারের শিশু, নারীসহ সবাই বিভিন্ন কাজে লিপ্ত হয়। ফলে ইচ্ছা থাকলেও তারা লেখাপড়া করতে পারে না। বাল্যবিবাহ, অপরাধ, শিশু ও নারী নির্যাতন ইত্যাদি বস্তিতে অনেক বেশি।

৯. বেকার সমস্যা (Unemployment)

বেকার বলতে বুঝায় যে ব্যক্তি কাজ জানে, কাজে নিয়োজিত হবার ইচ্ছা পোষণ করে অথচ কাজ পায় না। বিশ্বের অনেক দেশেই বেকার সমস্যা বিদ্যমান। বেকার সমস্যা সামাজিক জীবনে হতাশার সৃষ্টি করে। এর ফলে অনেক পরিবারে ফাটল ধরে। বাংলাদেশে বেকারত্বের মধ্যে মৌসুমী বেকার, প্রছন্ন বেকার, আকস্মিক বেকার, প্রযুক্তিগত বেকারের হার অনেক বেশি। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব, তাত্ত্বিক শিক্ষার প্রাধান্য, যথাযথ উন্নয়ন পরিকল্পনার

অভাব, নারী শিক্ষার অভাব ও নারী নির্যাতন, অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ ইত্যাদি কারণেও বেকারত্ব সৃষ্টি হয়। বেকারত্ব জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা।

১০. শিশু নির্যাতন (Child Abuse)

আন্তর্জাতিকভাবে শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত চার ধরনের কর্মকাণ্ডকে শিশু নির্যাতন বলে অভিহিত করা হয়। এগুলো হলো ১) শারীরিক নির্যাতন, ২) যৌন হয়রানি, ৩) আবেগিক নির্যাতন ও ৪) অবহেলামূলক নির্যাতন। বাংলাদেশে উপরিল্লিখিত শিশু নির্যাতনগুলো খুব বেশী। বিশেষ করে প্রায়ই এখানে গৃহকর্ত্রী কর্তৃক কাজের শিশু নির্যাতিত হয়। কর্মক্ষেত্রে শিশুরা মালিকপক্ষ কর্তৃক নির্যাতিত হয়। কখনও মৃত্যুওবরণ করে। এছাড়া শিশুদের প্রতি প্রকাশ্য ও নীরবে আরও অনেক নির্যাতন (যৌন আবেগিক ও অবহেলামূলক) ঘটে থাকে। অনেক সময় শিশু অভিভাবকদের ও আত্মীয়স্বজন কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়। নির্যাতন শিশুর শারীরিক, মানসিক, আবেগিক, দৈহিক বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্থ করে।

১১. সন্ত্রাস (Terrorism)

সন্ত্রাসের মূলকথা বল প্রয়োগ বা বল প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন করে কোনো উদ্দেশ্য সাধন বা কার্যোদ্ধারের চেষ্টা কর। সন্ত্রাস বিভিন্ন ধরনের হয়। যেমন– অপরাধী চক্র দ্বারা সংঘঠিত সন্ত্রাস, রাজনৈতিক সন্ত্রাস, আদর্শভিত্তিক সন্ত্রাস, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ইত্যাদি। অর্থনৈতিক বৈষম্য, সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, সুশাসনে অভাব, অবৈধ অস্ত্রের সহজলভ্যতা, ধর্মীয় উগ্রবাদ ইত্যাদি বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড সন্ত্রাসের সৃষ্টির পেছনে কাজ করে। সন্ত্রাস সামাজিক শান্তি নষ্ট করে ও রাষ্ট্রীয় উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করে নাগরিকের জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে। তাই সন্ত্রাস প্রতিরোধে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি।

শিক্ষার সাথে সামাজিক সমস্যার সম্পর্ক
Relation Between Social Problems and Education

সামাজিক সমস্যাগুলোর সাথে শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়, দরিদ্র পরিবারের সন্তান ও বস্তিবাসীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক দিক থেকে সমাজের নিচু স্তরে অবস্থান করায় লেখাপড়ার তেমন সুযোগ পায় না। ফলে এদের মধ্যে নিরক্ষরতা ও বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার বেশি। এই নিরক্ষর ও স্বল্প শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অনেকে সন্ত্রাস, কিশোর অপরাধ, মাদকাশক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যায় জড়িয়ে পড়ে। আবার শিক্ষার সাথে রয়েছে জেন্ডার বা লিঙ্গ বৈষম্যের আন্তঃসম্পর্ক। অনেক পরিবারের মেয়ে সন্তানেরা লেখাপড়ার সুযোগ পায় না। বিদ্যালয়ে জেন্ডারের বৈষম্যের কারণে শিক্ষার্থীদের সাথে ভিন্ন রকম আচরন করা হয়। সমাজের অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদের ছেলেদের তুলনায় কম সুযোগ দেওয়া হয়।

শিক্ষার্থীদের অর্থনৈতিক স্তরবিন্যাসের সাথে শিক্ষার সুযোগের সম্পর্ক আছে। যেমন- দরিদ্র পরিবারের সন্তানেরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, মাদ্‌রাসা এবং নিম্নমানের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যায়। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের, পেশাগত মান এবং শিক্ষার সুযোগ সুবিধা (প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি, শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি) অপ্রতুল। অনুকূল ফলে সেখানে দরিদ্র পরিবারের সন্তানেরা গুণগতমানের শিক্ষার সুযোগ পায় না যা উন্নত স্কুলে ভালো অর্থনৈতিক অবস্থার ছেলে মেয়েরা পেয়ে থাকে। এতে মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের অর্জিত কৃতিত্বের (Achievement) ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়। নিরক্ষর, দরিদ্র জনগোষ্ঠী শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে এদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধের ঘাটতি দেখা যায়। ফলে এদের মধ্যে বাল্য বিবাহ, যৌতুক, তালাক ইত্যাদির সমস্যাগুলো বেশি দেখা যায়।

সামাজিক সমস্যা রোধে শিক্ষার ভূমিকা
The Role of Education in Eradicating Social Problems

John Dewey বলেছেন- "Education is not preparation for life, education is life itself." অর্থাৎ শিক্ষা জীবনের প্রস্তুতি নয় বরং শিক্ষাই হচ্ছে জীবন। শিক্ষা শিশুকে গড়ে। তার সুপ্ত প্রতিভার এবং সামাজিক গুণাবলি ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ সাধনের মাধ্যমে তাকে একজন পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত করে। কিন্তু শিক্ষা যদি যথাযথ না হয় তা ব্যক্তিকে নষ্ট করে। আর যথাযথ শিক্ষার অভাব বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা তৈরি করে। সমাজের সকলের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার সুযোগ তৈরির মাধ্যমে তা অনেকাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

বিদ্যালয়ে শিশু পড়াশুনা করে এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হয়। তাই বিদ্যালয়ে যথাযথ শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। শিক্ষাক্রমে সামাজিক সমস্যাগুলো প্রতিফলনের মাধ্যমে এগুলোর বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথাযথ মূল্যবোধ তৈরি করতে হবে। শিক্ষার্থীদের আচরণের যথাযথ বিকাশে শিক্ষকদেরকে ভূমিকা পালন করতে হবে। বিদ্যালয় যেহেতু সমাজের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ, তাই বিদ্যালয়কে সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতামূলক ও প্রতিরোধমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। সামাজিক সমস্যাগুলো প্রতিরোধে নৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে। সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ তৈরি করতে হবে এবং মেয়েদের শিক্ষার অধিকার যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। বস্তিবাসীদের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং প্রযুক্তিগত শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। মোটকথা, শিক্ষাকে সামাজিক সমস্যা রোধের একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৮

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বাংলাদেশে প্রায় কত ভাগ লোক নিরক্ষর?
   ক. ৬০
   খ. ৩৭
   গ. ৫০
   ঘ. ৪৭

২. সাধারণ কত বয়সের শিশুর অপরাধকে কিশোর অপরাধ বলে?
   ক. ১০-১২ বছর
   খ. ১২-১৫ বছর
   গ. ৮-১৭ বছর
   ঘ. ৮-১৮ বছর

৩. শিক্ষা জীবনের প্রসূতি নয়, বরং শিক্ষাই হচ্ছে জীবন– কে বলেছেন?
   ক. রবীন্দ্রনাথ
   খ. রুশো
   গ. মাওলানা ভাসানী
   ঘ. ডিউই

উত্তরমালা: ১. খ, ২. গ, ৩. ঘ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. সামাজিক সমস্যা কী?
২. নিরক্ষরতার কারণ কী।
৩. নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার কেন হয়?
৪. যৌতুককে কেন সামাজিক ব্যাধি বলা হয়?
৫. বাংলাদেশে বস্তি কেন গড়ে উঠছে?
৬. বস্তিবাসীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কী করা উচিত?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. সামাজিক সমস্যা কাকে বলে। বাংলাদেশের প্রধান ৩টি সামাজিক সমস্যা ও এর কারণ ব্যাখ্যা করুন।
২. নারীর বিরুদ্ধের সহিংসতা বলতে কী বুঝায়? বাংলাদেশ সংঘঠিত এ ধরনের অপরাধগুলোর ধরনের বিশ্লেষণ করুন।
৩. শিক্ষার সাথে সামাজিক সমস্যাগুলোর আন্ত:সম্পর্ক উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
৪. সামাজিক সমস্যাবোধে শিক্ষার ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।